টুকরা দিয়ে মোতি গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সে মনে করবে না যে, সে এই মোতিটি কিছু দিয়ে গ্রহণ করেছে। সে মাটির এই ভাঙ্গা টুকরার কথা কোনদিন চিন্তাও করবে না। মোতির তুলনায় মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা যেমন নগণ্য ও হেয়, আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় দুনিয়া আরও বেশী তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। সুতরাং যুহদের পরাকাষ্ঠা এই স্তরেই নিহিত। এরূপ যাহেদ কখনও দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে- এরূপ আশংকা নেই।

যুহদে যে বস্তু কাম্য হয়ে থাকে, তারও তিনটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দোযখের আগুন, কবরের আযাব, হিসাব-নিকাশের বিপদ, পুলসিরাতের বিপদ ইত্যাদি থেকে মুক্তি কাম্য হওয়া। এরূপ কামনা নিয়ে তারা যুহদ করে, যাদের মধ্যে খওফ অর্থাৎ, ভয় প্রবল।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে যুহদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সওয়াব, পুরস্কার ও জান্নাতের অনাবিল সুখ কাম্য হওয়া । এরূপ কামনা নিয়ে তারা যুহদ করে, যাদের মধ্যে রিজা অর্থাৎ, আশা প্রবল।

তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে যুহদে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর দীদার কাম্য হওয়া এবং দোযখের কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রতিও ভ্রূক্ষেপ না করা, জান্নাতের হূর, প্রাসাদ ইত্যাদি সুখ-সম্ভোগের প্রতিও লক্ষ্য না থাকা। আপাদমস্তক আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমজ্জিত থাকা। সত্য বলতে কি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু কামনা না করাই হচ্ছে সত্যিকার তাওহীদ-বিশ্বাস। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু কামনা করা "শিরকে খফী" তথা গোপন শিরক। এই রকম যুহদ তারাই করে, যারা আল্লাহর আশেক ও দোস্ত। আর তারাই হচ্ছে আরেফ। কেননা, যে আল্লাহকে চিনে, সেই তাঁকে মহব্বত করে। যে ব্যক্তি দীনার ও দেরহামকে চিনে এবং একথাও যানে যে, উভয়টি এক সাথে রাখতে পারবে না, সে দীনারকেই রাখবে এবং তাকে মহব্বত করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দীনার ও দেরহামকে চিনে এবং একথাও জানে যে, আল্লাহর দীদার এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি, হূর-গেলমান, প্রাসাদ এক সাথে দেখা সম্ভবপর নয়, সে অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর দীদারই কামনা করবে।

যে বস্তু থেকে যুহদ করা হয়, তার দিক দিয়েও যুহদের অনেক স্তর রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে যুহদ করা উচিত, এমনকি

নিজ সত্তা থেকেও যুহদ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নফসের উপকারী বিষয় থেকে যুহদ করা; যেমন খাহেশ, ক্রোধ, অহংকার, ক্ষমতালিপ্সা ইত্যাদি। তৃতীয়ত, জাঁকজমক ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি থেকে যুহদ করা। চতুর্থত, জ্ঞান, সক্ষমতা, দীনার ও দেরহাম থেকে যুহদ করা। যে জ্ঞান ও সক্ষমতার দ্বারা মানুষের অন্তরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে তাই উদ্দেশ্য। বর্ণিত বিষয়সমূহ এভাবে সম্প্রসারিত করা হলে যেসব বিষয় থেকে যুহদ করতে হবে, সেগুলোর সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে এগুলোর মধ্য থেকে সাতটি উল্লেখ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, মানুষকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী।

অন্য এক আয়াতে এগুলোকে পাঁচ করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ -

অর্থাৎ, জেনে রাখ, পার্থিব জীবন হচ্ছে তামাশা, ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার এবং ধন ও জনের মধ্যে প্রাচুর্যের বিকাশ।

এরপর আরও এক আয়াতে এগুলোকে দু'য়ে সীমিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো কেবল তামাশা ও ক্রীড়াকৌতুক।

এরপর সবগুলোকে একের মধ্যে শামিল করে ব্যক্ত করা হয়েছে—

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

অর্থাৎ, এবং যে নিজেকে খেয়ালখুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

এখানে هوى তথা খেয়ালখুশী শব্দটি যাবতীয় জৈবিক কামনা বাসনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব, এ থেকেই যুহদ করা উচিত। বলা বাহুল্য, আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পার্থক্য শুধু এই যে, এক আয়াতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে সংক্ষেপে। সারকথা, যুহদ হচ্ছে যাবতীয় জৈবিক কামনা-বাসনা থেকে মন তুলে নেয়া। জৈবিক বাসনা থেকে মন তুলে নিলে দুনিয়া থেকেও তুলে নেয়া হবে এবং অবশ্যই আশা-নেশাও খাটো হবে। কারণ, ভোগ-বিলাসের জন্যেই জীবন কাম্য হয়ে থাকে এবং এর জন্যেই মানুষ স্থায়িত্ব কামনা করে। যখন ভোগ-বিলাস থেকেই মন তুলে নেয়া হবে, তখন জীবনও কাম্য থাকবে না। এ কারণেই যখন প্রথম প্রথম জেহাদ ফরয করা হয়, তখন অনেকেই বলতে থাকে—

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর জেহাদ ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে আরও কিছুকাল বাঁচতে দিলেন না কেন?

জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করলেন—

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

অর্থাৎ, হে নবী, বলে দিন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অল্প দিনের।

অর্থাৎ, তোমরা তো ভোগের জন্যেই বেঁচে থাকতে চাও। জেনে রাখ, সেটা সামান্যই। এরপর যুহদকারী ও মুনাফিকদের অবস্থা স্পষ্ট হয়ে গেল। যারা আল্লাহর মহব্বত রাখত এবং যুহদ করত, তারা আল্লাহর পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে যুদ্ধ করল। জেহাদের ডাক এলেই তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জান্নাতের সুবাস ছড়িয়ে পড়ত এবং তারা আগুনে পতঙ্গের মত

যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যাতে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখতে এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তাদের কেউ বিছানায় মৃত্যুর সম্মুখীন হলে শাহাদতের মর্যাদা না পাওয়ার কারণে দুঃখ ও পরিতাপের অন্ত থাকত না। ইসলামের বীর সেনানী হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ শেষ বয়সে যখন বিছানায় মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে থাকেনঃ আমি শাহাদতপ্রাপ্তির আশায় অনেক রণাঙ্গনে কাফেরদের দুর্ভেদ্য সারিতে ঢুকে গেছি; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে মর্যাদা পাইনি। আজ বৃদ্ধদের মত মৃত্যুবরণ করছি। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর দেহে আটশ' ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। এটা ছিল সত্যিকার ঈমানদারদের অবস্থা। অপরদিকে মুনাফিকদের অবস্থা কি ছিল? তারা মৃত্যুর ভয়ে কাপুরুষের মত দল ত্যাগ করে চলে যেত। তাদেরকে বলা হত—

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ

অর্থাৎ, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, তা তোমাদেরকে ধরবেই।

তারা জীবিত থাকাকে শাহাদতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করেছিল। ফলে তাদের অবস্থা এই হল যে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ -

অর্থাৎ, তারা ক্রয় করেছে পথভ্রষ্টতাকে হেদায়েতের বিনিময়ে। ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়নি।

খাঁটি বান্দারা তো জান্নাতপ্রাপ্তির অঙ্গীকারে নিজেদের জান ও মাল আল্লাহ তা'আলার হাতে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা যখন দেখবে, বিশ-বাইশ বছর ভোগের বিনিময়ে অনন্ত সুখ অর্জিত হয়েছে, তখন তাদের আনন্দের সীমা থাকবে না।

যুহদের সংজ্ঞা সম্পর্কে মনীষীদের যে সব উক্তি বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোতে কেবল যুহদের কয়েক প্রকারই বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকেই এ

প্রসঙ্গে হয় সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল কিছু লিখেছেন, না হয় নিজের মধ্যে যা প্রবল দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ হযরত বিশর বলেনঃ দুনিয়া থেকে যুহদ করা অর্থ হচ্ছে লোকজন থেকে যুহদ করা। এ উক্তিতে কেবল জাঁকজমক থেকে যুহদ করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হযরত কাসেম জওয়ী বলেন ঃ দুনিয়া থেকে যুহদ কেবল উদর থেকে যুহদকে বলা হয়। মানুষ যতই উদরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে, ততই তার যুহদ হবে। এতে একটি খাহেশের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা অন্যান্য খাহেশ অপেক্ষা গুরুতর।

হযরত ফুযায়ল বলেনঃ দুনিয়া থেকে যুহদের উদ্দেশ্য অল্পে তুষ্ট থাকা। এতে কেবল ধন-সম্পদ থেকে যুহদ বুঝানো হয়েছে। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেনঃ যুহদ আশা ও নেশাকে খাটো করার নাম। এ উক্তিতে যাবতীয় খাহেশ অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যার আশা খাটো হয়, সে যেন সকল খাহেশ থেকে মন তুলে নেয়। হযরত ওয়ায়স বলেনঃ যুহদকারী যখন জীবিকার অন্বেষণে বের হয়, তখন তার যুহদ পণ্ড হয়ে যায়। এ উক্তিতে যুহদের সংজ্ঞা বর্ণিত হয়নি; বরং তাতে তাওয়াক্কুলের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

হাদীসবিদগণ বলেনঃ দুনিয়া হচ্ছে বুদ্ধির মাধ্যমে আমল করা। আর যুহদ হচ্ছে এলেমের অনুসরণ করা এবং সুন্নতের অনুসরণকে অপরিহার্য করে নেয়া। এতে কেবল জাঁকজমকের কিছু সামগ্রীর প্রতি অথবা নিরর্থক খাহেশের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উদাহরণতঃ এমন কিছু শাস্ত্র রয়েছে, যার কোন উপকারিতা নেই। কিন্তু মানুষ সেগুলোকে এত বিস্তৃতি দিয়েছে যে, কেউ সারা জীবন তাতে ব্যাপৃত থাকলেও পূর্ণরূপে অর্জন করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং যুহদকারীর জন্যে প্রথমে অনর্থক বিষয় থেকে যুহদ করা প্রয়োজন।

হযরত হাসান বলেনঃ যুহদকারী সে ব্যক্তি, যে কাউকে দেখে বলে উঠে, সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, তাঁর মতে বিনয়ের অপর নামই যুহদ। এতে জাঁকজমক ও আত্মম্ভরিতা না থাকার প্রতি ইশারা আছে, যা যুহদের একটি প্রকার মাত্র। ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেনঃ যে ব্যক্তি কষ্টে সবর করে, খাহেশ পরিত্যগ করে এবং হালাল পথে রুযী-রোযগার করে, মৌলিক যুহদ সে-ই অর্জন করতে পেরেছে।

যুহদ সম্পর্কে এমনি ধরনের আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। মনীষীগণের এরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করার কারণ এটা নয় যে, এ বিষয়ে

তাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল; বরং কারণ এই যে, তারা যা বর্ণনা করেছেন, প্রয়োজনের মুহূর্তেই বর্ণনা করেছেন। ফলে যে পরিমাণ প্রয়োজন দেখেছেন, সে পরিমাণই বর্ণনা করেছেন। প্রয়োজন বিভিন্নরূপ হয় বিধায় তাদের জওয়াবও বিভিন্নরূপ হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে আবু সোলায়মান দারানী যা বলেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও পূর্ণাঙ্গ ও স্বরূপ প্রকাশক। তিনি বলেনঃ যুহদ সম্পর্কে আমরা অনেক বক্তব্য শুনেছি। আমাদের মতে যুহদ হচ্ছে আল্লাহর পথে যা কিছু অন্তরায়, তা বর্জন করা। তাঁর আরও একটি উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি বিবাহ করে অথবা জীবিকার জন্যে সফর করে অথবা হাদীস লিপিবদ্ধ করে, সে দুনিয়াপ্রবণ। এতে তিনি এসব বিষয়কে যুহদের খেলাফ ব্যক্ত করেছেন। একবার তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন—

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থাৎ, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসে।

তিনি বলেনঃ এখানে সুস্থ অন্তর অর্থ সে অন্তর যাতে আল্লাহ ছাড়া কোনকিছু নেই।

বিধানের দিক দিয়ে যুহদ তিন স্তরে বিভক্ত— ফরয, নফল ও মোস্তাহাব। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম তাই বলেন। হারাম বিষয় থেকে যুহদ করা ফরয।

অন্তরের গোপন বিষয়াদি ত্যাগ করার দিকে লক্ষ্য করলে যুহদের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কেননা, অন্তরের গোপন বিষয়াদি যেমন— কুচিন্তা, জল্পনা-কল্পনা এবং গোপন রিয়া ইত্যাদির কোন শেষ নেই; বরং বাহ্যিক বিষয়াদির মধ্যেও যুহদের স্তর অসীম। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সেই যুহদ, যা হযরত ঈসা (আঃ) অর্জন করেছিলেন। তিনি একবার মাথার নিচে পাথর রেখে শুয়েছিলেন। শয়তান এসে বললঃ আপনি তো দুনিয়া বর্জন করেছিলেন। এখন একি দেখছি? তিনি বললেনঃ তুমি আমার মধ্যে দুনিয়ার কি দেখলে? শয়তান বললঃ আপনি মাথার নিচে পাথর রেখেছেন, যাতে মাথা উঁচু থাকে এবং আপনি আরাম পান। তিনি মাথার নিচ থেকে পাথরটি বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ নিয়ে যা, এই পাথর এবং দুনিয়া উভয়টিই নিয়ে যা।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সদাসর্বদা চট পরতেন। ফলে তাঁর দেহে চটের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। ত্বক আরাম পাবে—এই ভয়ে তিনি নরম পোশাক পরতেন না। তার স্নেহময়ী জননী বললেনঃ চটের পরিবর্তে পশমের জামা পর। তিনি তাই করলেন। পরক্ষণেই ওহী আগমন করলঃ হে ইয়াহইয়া, আমার উপর দুনিয়াকে পছন্দ করে নিলে? তিনি কাঁদতে কাঁদতে জামা খুলে ফেলে পূর্বের মত চটের পোশাক পরে নিলেন।

হযরত ইমাম আহমদ বলেনঃ হযরত ওয়ায়সের যুহদই ছিল যুহদ। তার উলঙ্গতার সীমা এতদূর পৌঁছেছিল যে, তিনি একটি চাটাইয়ের থলে বানিয়ে তাতে বসে থাকতেন। হযরত ঈসা (আঃ) একটি দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন। দেয়ালের মালিক তাঁকে সেখান থেকে তুলে দিল। তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে তুলে দাওনি; বরং আমার জন্যে ছায়ার সুখ যার অভিপ্রেত নয়, তিনিই তুলে দিয়েছেন।

মোটকথা, ভেতর ও বাইর উভয় দিক দিয়ে যুহদের স্তর অসংখ্য। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে প্রত্যেক সন্দেহযুক্ত ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে যুহদ করা। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ হালাল বস্তু থেকে যুহদ করলেই সেটাকে যুহদ বলা হবে। সন্দিগ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে যুহদ করলে সেটা যুহদের কোন স্তরে পড়ে না। বর্তমান যুগে হালালের অস্তিত্ব নেই বিধায় এখন তার মতে যুহদ অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বর্জন করাই যখন যুহদ, তখন পানাহার করা, পোশাক পরা, মানুষের সাথে মেলামেশা করা ও কথাবার্তা বলার পরও যুহ্দ কিরূপে হবে? কেননা, এসব বিষয়ে মশগুল হওয়া তো আল্লাহ ছাড়া অন্য বিষয়ে মশগুল হওয়া। জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলাতে মশগুল হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দিকে সর্বান্তঃকরণে ও সর্বপ্রযত্নে মনোযোগী হওয়া। এটা জীবন ধারণ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। জীবন ধারণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং মানুষ যদি এবাদতে দেহ দ্বারা সাহায্য নেয়ার উদ্দেশে দেহের জন্যে ক্ষতিকারক বিষয়াদিকে প্রতিহত করে, তবে একাজ দ্বারা সে গায়রুল্লাহর মধ্যে মশগুল হবে না। কেননা, যে কাজ ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হয় না, সে

কাজও উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয়। এমনিভাবে এবাদতের উদ্দেশ্যে দেহকে ক্ষুধা, পিপাসা, উত্তাপ ও শৈত্য থেকে পানাহার, পোশাক ও বাসস্থান দ্বারা হেফাযত করাও উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য হবে, যদি তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়। সুতরাং এসব বিষয় যুহদের পরিপন্থী নয় বরং এগুলো জরুরী।

জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে যুহদের সীমা ঃ মানুষ দু'রকম বিষয়ে মশগুল রয়েছে—প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। অপ্রয়োজনীয় বিষয় যেমন পালিত ঘোড়া। মানুষ অধিকাংশ সময় আরামে সওয়ার করার জন্যে ঘোড়া রাখে, অথচ পায়ে হেঁটেও চলতে পারে। প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন আহার করা, পান করা ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিমাণ, প্রকার ও সময়ের দিক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে যুহদের সীমা বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় বিষয় মোটামুটি ছয়টি—(১) অন্ন, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান, (৪), আসবাবপত্র, (৫) পরিবার-পরিজন ও (৬) ধন-সম্পদ। নিম্নে এসব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) অন্ন মানুষের জন্যে এই পরিমাণ জরুরী, যা তাকে সুস্থ ও সবল রাখে। কিন্তু এতে যুহদ অর্জন করার জন্যে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কিছুটা হ্রাস করতে হবে। দৈর্ঘ্য হচ্ছে সারা জীবনের দিক দিয়ে। কেননা, কেউ একদিনের অন্ন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। আর প্রস্থ হয় অন্নের পরিমাণ, প্রকার ও সময়ের মধ্যে। অতএব দৈর্ঘ্য হ্রাস করার উপায় হচ্ছে আশাকে খাটো করা। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে যখন তীব্র ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির আশংকা দেখা দেয়, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি পরিমাণে আহার্য গ্রহণ করা। যে এরূপ করবে, সে দিনের খাদ্য থেকে কিছু রাতের জন্য রেখে দেবে না। এটা যুহদের সর্বোচ্চ স্তর। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে একমাস অথবা চল্লিশ দিনের জন্যে খাদ্য সঞ্চিত করে রাখা। তৃতীয় স্তর হচ্ছে এক বছরের জন্যে সঞ্চিত করা। এটা দুর্বল যুহদকারীদের অবস্থা। যে ব্যক্তি এক বছরের বেশী সময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে, তাকে যুহদকারী বলা অসম্ভব। সে নিশ্চিতই দীর্ঘ আশাবাদী। হাঁ, যদি কোন পেশা না থাকে এবং মানুষের কাছে সওয়াল করতে মন না চায়, তবে এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করায় দোষ নেই; যেমন, হযরত দাঊদ তায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ দীনার প্রাপ্ত হয়ে তা সঞ্চয় করে

রাখেন এবং বিশ বছরে ব্যয় করেন। এটা তার যুহদের খেলাফ ছিল না। তবে যাদের মতে যুহদে তাওয়াক্কুল শর্ত, এটা তাদের খেলাফ।

পরিমাণের দিক দিয়ে প্রস্থ হ্রাস করার মাত্রা হচ্ছে একদিন ও একরাতের জন্যে নিম্নে এক পোয়া, মাঝারি আধাসের এবং সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ আহার করা, যা কাফ্‌ফারায় মিসকীনদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি এর বেশী আহার করবে, সে অতিভোজী ও উদরসেবী বলে গণ্য হবে।

প্রকারের দিক দিয়ে হ্রাসের মাত্রা হচ্ছে যে খাদ্য সুলভ, তাই আহার করা, তা ভুষির রুটি হোক না কেন। মাঝারি স্তরে যব ও বুটের রুটি আহার করা এবং সর্বোচ্চ স্তরে চালা হয়নি এমন গমের রুটি আহার করা। যে ব্যক্তি চালা গমের রুটি আহার করবে, সে যুহদের সর্বনিম্ন স্তর থেকেও খারিজ হয়ে যাবে। ব্যঞ্জনের মধ্যে নিম্নে লবণ, অথবা শাক অথবা সিরকা, মাঝারি স্তরে যয়তূনের তৈল অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত বস্তু এবং উচ্চস্তরে যে কোন প্রকার গোশ্‌ত। এটা সপ্তাহে এক দু'বার হবে। দু'বারের বেশী হলে যুহদের কোন প্রকারেই দাখিল থাকবে না।

সময়ের দিক দিয়ে হ্রাসের মাত্রা নিম্নে রাতে ও দিনে একবার আহার করা অর্থাৎ রোযা রাখা। মাঝারি স্তরে একদিন রোযা রাখা ও রাতে না খেয়ে শুধু পানি পান করা, দ্বিতীয় দিন রোযা রেখে রাতে খাওয়া পানি পান করবে না এবং উচ্চস্তরে তিন দিন অথবা সপ্তাহের রোযা রাখা। এসব ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তাঁরা খাদ্য ও ব্যঞ্জন হ্রাস করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যেত, যখন প্রদীপও জ্বলত না এবং আগুনও জ্বালানো হত না। কেউ প্রশ্ন করলঃ তা হলে পানাহার কেমন করে চলত? তিনি বললেনঃ দু'টি কাল বস্তু— খোরমা ও পানি দিয়ে। এখানে গোশ্‌ত, শোরবা, ব্যঞ্জন ইত্যাদি সবকিছুর বর্জন পাওয়া যায়। হযরত হাসান বলেনঃ রসূলে খোদা (সাঃ) গাধায় আরোহণ করতেন, পশমের বস্ত্র পরিধান করতেন, ছেঁড়া জুতা ব্যবহার করতেন এবং আহারের পর অঙ্গুলি লেহন করতেন। তিনি মাটিতে বসে আহার করতেন এবং বলতেনঃ আমি দাস এবং দাসের মতই আহার

করি এবং বসি। হযরত ফুযায়ল বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর কখনও তিন দিন পেট ভরে রুটি খাননি। হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ হে বনী ইসরাঈল, খাঁটি পানি পান কর এবং জঙ্গলের শাক ও যবের রুটি খাও—গমের রুটি থেকে বিরত থাক। তোমরা এর শোকর আদায় করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কুবাবাসীদের কাছে আগমন করেন, তখন তারা দুধে মধু মিশিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করে। তিনি পিয়ালা রেখে দেন এবং বলেনঃ আমি এটা হারাম করি না; কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ের জন্যে বর্জন করছি।

(২) বস্ত্রের মধ্যে নিম্নস্তর হল এমন পোশাক, যা উত্তাপ ও শৈত্য দূর করে এবং উলঙ্গতা নিবারণ করে। এরূপ পোশাক হচ্ছে একটি চাদর ও একটি পায়জামা। এর বেশী বস্ত্র হলে, সেটা যুহদের সীমার বাইরে। যুহদের জন্যে শর্ত এই যে, যখন কাপড় ধৌত করে, তখন দ্বিতীয় কাপড় পরিধানের জন্যে না থাকা। তখন যুহদকারী ঘরে বসে থাকবে। জামা, পায়জামা ও পাগড়ী দু'টি করে থাকলে, সেটা যুহদের সকল প্রকারের বাইরে।

পোশাকের প্রকারের মধ্যে নিম্নস্তর হচ্ছে মোটা চট, মাঝারি স্তর কম্বল এবং উচ্চস্তর মোটা সূতী বস্ত্র। এ ব্যাপারে সর্বাধিক সময় হচ্ছে এক বছর পরিধান করা যায় এমন পোশাক এবং সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে এক দিন পরিধান করা যায় এমন কাপড়। মাঝারি সময় এমন পোশাক, যা এক মাস অথবা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত পরা যায়। সুতরাং এক বছরের বেশী টিকে এমন কাপড় তালাশ করা যুহদের পরিপন্থী। কেউ এই পরিমাণের বেশী কাপড় পেলে সে অন্যকে দিয়ে দেবে। কেননা, রেখে দিলে যুহদ বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারেও পয়গম্বর এবং সাহাবায়ে কেরামেরও তরীকার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

হযরত আবু বুরদা (রাঃ) বলেনঃ হযরত আয়েশা আমাকে একটি চাদর ও একটি মোটা বস্ত্র দেখিয়ে বললেনঃ এ দু'টি বস্ত্রেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়েছে।

একবার হযরত আমর ইবনে আসওয়াদ বললেনঃ আমি কখনও খ্যাতির বস্ত্র পরিধান করব না, কখনও রাতে বিছিয়ে শুব না, কখনও উৎকৃষ্ট

সওয়ারীতে সওয়ার হব না এবং কখনও পেটপুরে আহার করব না। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর তরীকা দেখতে পছন্দ করে, সে আমর ইবনে আসওয়াদকে দেখুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক বস্ত্র ক্রয় করেন, যার মূল্য ছিল চার দেরহাম। তাঁর বস্ত্র জোড়াটি ছিল দশ দেরহামের। তাঁর লুঙ্গি দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার হাত ছিল। মাঝে মাঝে তিনি দু'টি এয়ামনী মোটা চাদর পরিধান করতেন, যার নাম ছিল হুল্লা। তিনি তিন দেরহাম দিয়ে পায়জামা খরিদ করেছেন। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি হলদে রেখাবিশিষ্ট রেশমী চাদর পরিধান করেন, যার মূল্য ছিল দু'শ' দেরহাম। সাহাবায়ে কেরাম এসে চাদরটি স্পর্শ করতেন এবং অবাক হয়ে বলতেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এটি আপনার কাছে জান্নাত থেকে এসেছে। অথচ সেটি আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস তাঁর জন্য হাদিয়ারূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনার্থে চাদরটি পরিধান করেন। এরপর খুলে জনৈক মুশরিকের কাছে প্রতিদানস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনার পর তিনি পুরুষদের জন্যে রেশমী বস্ত্র হারাম ঘোষণা করেন। এমনিভাবে তিনি একদিন সোনার আংটি পরিধান করেন এবং পরক্ষণেই খুলে ফেলেন। অতঃপর পুরুষদের জন্যে তা হারাম ঘোষণা করেন।

রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার বললেনঃ আকাশের ফেরেশতারা আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতি দেখে বাহ্যত হাসে; কিন্তু গোপনে আযাবের ভয়ে কাঁদে। তাদের বোঝা অন্যের উপর হালকা এবং নিজেদের উপর ভারী। তারা ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করে এবং দুনিয়াত্যাগী দরবেশদের অনুসরণ করে। তাদের দেহ পৃথিবীতে থাকলেও অন্তর আরশের নিকটে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন—যদি তুমি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তবে ধনীদের কাছে বসা থেকে বিরত থাকবে এবং তালি না লাগা পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বর্জন করবে না। হযরত ওমরের কাপড়ে বারটি তালি ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ছিল চামড়ার। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেনঃ পোশাক এমন হওয়া উচিত, যা বিজ্ঞজনদের কাছে খ্যাতি নয় এবং সাধারণ লোকের কাছে ঘৃণার নয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ আমি সুফিয়ান ছওরীর পোশাকের মূল্য এক দেরহাম অপেক্ষা কিছু বেশী অনুমান করেছি। ইবনে শায়বা বলেন ঃ আমার কাপড়সমূহের মধ্যে সেটি উত্তম, যেটি আমার খেদমত করে, আর মন্দ কাপড় সেগুলো, যেগুলোর খেদমত আমি করি। আবু সোলায়মান দারানী বলেনঃ কাপড় তিনটি—এক, আল্লাহর ওয়াস্তে যা দ্বারা উলঙ্গতা নিবারণ হয়। দুই, নফসের জন্যে, যার কোমলতা কাম্য হয় এবং তিন, মানুষের জন্যে, যার সৌন্দর্য উদ্দেশ্য হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ যার কাপড় পাতলা, তার ধর্মও পাতলা। আরও এক বুযুর্গ বলেনঃ প্রথম যুহদ পোশাকের যুহদ।

হাদীসে আছে اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ, পোশাকের পুরানত্ব ঈমানের অঙ্গ। মিসরের শাসনকর্তা ফুযালা ইবনে ওবায়দের মাথার চুল বিক্ষিপ্ত এবং মাথা খালি দেখে এক ব্যক্তি বলল ঃ আপনি একজন নেতা হয়ে এমন করেন কেন? তিনি বললেনঃ রসূলে আকরাম (রাঃ) আমাদেরকে আরাম করতে নিষেধ করেছেন এবং কখনও খালি পায়ে থাকারও নির্দেশ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুরূপ পোশাক পরে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আমার উম্মতের মন্দ লোক তারা, যারা রঙ-বেরঙের খাদ্য ও পোশাকের চিন্তায় থাকে।

(৩) বাসস্থানে যুহদ করারও তিনটি স্তর রয়েছে। উৎকৃষ্ট স্তর হচ্ছে কোন স্থান নিজের জন্যে তালাশ না করা; বরং আসহাবে সুফফার ন্যায় মসজিদের কোণে পড়ে থেকে তুষ্ট থাকা। মাঝারি স্তর হচ্ছে খড় ও ছনের কুঁড়েঘর তৈরী করে নেয়া। নিম্নস্তর হচ্ছে কোন বিশেষ কক্ষ তৈরী করে অথবা ভাড়া করে তাতে বসবাস করা। এরূপ কক্ষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড় না হলে এবং তাতে সাজসজ্জা না থাকলে যুহদ বহির্ভূত হবে না।

মোটকথা, যে বস্তু প্রয়োজনের জন্যে কাম্য হবে, তার সীমা যেন প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে না যায়। দুনিয়াতে প্রয়োজন পরিমাণই ধর্মের সহায়ক। যে পরিমাণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে, সে পরিমাণই ধর্মের খেলাফ। বাসস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে রোদ, বৃষ্টি ও শৈত্য থেকে আত্মরক্ষা। কতটুকুর দ্বারা এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তা জানা, এর বেশী অপ্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি

অপ্রয়োজনীয় বস্তু অন্বেষণ করে, সে নিশ্চিতই যুহদ থেকে দূরে অবস্থান করে।

হযরত হাসান বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত কোন ইটের উপর ইট রাখেননি। অর্থাৎ, কোন প্রকার গৃহ নির্মাণ করেননি। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার অকল্যাণ চান, তার ধন-সম্পদ চুনা, বালি ও মাটির কাদায় বরবাদ করেন। হযরত নূহ (আঃ) একটি ঘর নির্মাণ করলে কেউ এসে আরয করলঃ ঘরটি পাকা হলেই তো ভাল হত। তিনি বললেনঃ যে মারা যাবে, তার জন্যে এটাই অনেক। হযরত হাসান বলেনঃ আমরা সাফওয়ান ইবনে মুহায়রিযের খেদমতে গেলাম। তিনি একটি বাঁশ নির্মিত ঘরে ছিলেন এবং ঘরটি নুয়ে পড়েছিল। আমাদের একজন বললঃ ঘরটি মেরামত করে নিলে ভাল হত। তিনি বললেনঃ অনেক মানুষ এ ঘরে থেকে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি।

এক হাদীসে আছে, প্রত্যেক খরচের জন্যে মানুষ সওয়াব পায়; কিন্তু পানি ও কাদাতে যা খরচ করা হয়, তাতে কোন সওয়াব হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে—

كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا أَمْكَنَ مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ

অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্যে বিপদের কারণ হবে; কিন্তু যা উত্তাপ ও শৈত্য থেকে রক্ষা করে (তা নয়)।

সিরিয়া যাবার পথে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) চুনা ও ইট নির্মিত একটি প্রাসাদ দেখেন। তিনি বলে উঠেনঃ আল্লাহু আকবার। আমার ধারণা ছিল না যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি হবে, যে হামানের মত রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করবে। কথিত আছে, সর্বপ্রথম যার জন্যে চুনা ও ইটের প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়, সে ছিল ফেরাউন। তার হুকুমেই হামান এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। এরপর তারই অনুসরণ করে অন্যান্য রাজা-বাদশাহরা রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করে।

জনৈক বুযুর্গ এক শহরে একটি জামে মসজিদ দেখে বললেন, আমি এ

মসজিদটি খেজুরের শাখা দিয়ে নির্মিত দেখেছি, এরপর কাঁচা মাটির চাঁই দ্বারা নির্মিত দেখেছি। আর এখন পাকা ইট দ্বারা নির্মিত দেখছি। যারা প্রথমে এটি নির্মাণ করেছিল, তারা দ্বিতীয় নির্মাণকারীদের তুলনায় উত্তম ছিল। আর দ্বিতীয়বার যারা নির্মাণ করেছে, তারা তৃতীয়বার নির্মাণকারীদের তুলনায় ভাল ছিল। পূর্ববর্তীদের মধ্যে কিছু লোক তাদের বাসগৃহ জীবনে কয়েক বার তৈরী করতেন। কারণ, তাদের বাসগৃহ খুব দুর্বল হত এবং তারা নিজেরা আশা খাটো রাখতেন। কেউ কেউ হজ্জ অথবা জেহাদে চলে যাওয়ার সময় ঘর ভেঙ্গে রেখে যেতেন অথবা কাউকে দান করে যেতেন। আবার ফিরে এলে নতুন ঘর তৈরী করে নিতেন। তাদের ঘর ছিল ঘাস ও চর্ম নির্মিত। আজ পর্যন্ত আরবদের মধ্যে এ অভ্যাস বিদ্যমান আছে। তাদের ঘরের উচ্চতা ছিল একজন মানুষের মাথার উপর অর্ধ হাত। হযরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করতাম, তখন হাত দিয়ে ছাদ স্পর্শ করতাম।

আমর ইবনে দীনার বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি ছয় হাতের উপরে উঁচু করে ঘর নির্মাণ করে, তখন এক ফেরেশতা তাকে ডেকে বলে ঃ হে নরাধম, আর কত উঁচু করবি? হযরত সুফিয়ান ছওরী মযবুত দালান দেখতে নিষেধ করেছেন। কারণ, কেউ না দেখলে এরূপ দালান নির্মিত হত না। সুতরাং যে তাকিয়ে থাকে, সে যেন নির্মাণকারীর সাহায্য করে। হযরত ফুযায়ল বলেনঃ আমি সে ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত হই না, যে দালান তৈরী করে এবং তা রেখে মারা যায়। বরং আমার বিস্ময় তাদের জন্যে, যারা এ দালানটি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। হযরত ইবনে মসঊদ বলেনঃ এক সম্প্রদায় আসবে, যারা দালানকে উঁচু করবে এবং ধর্মকে নীচু।

(৪) আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও যুহদের অনেক স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত। তিনি কেবল একটি চিরুনি ও পানি রাখার একটি মৃৎপাত্র সঙ্গে রাখতেন। একদিন এক ব্যক্তিকে নদীতে পানি পান করতে দেখে তিনি মৃৎপাত্রটিরও প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং সেটি ফেলে দেন।

মাঝারি স্তর হচ্ছে প্রয়োজন পরিমাণে আসবাবপত্র থাকা। কিন্তু এক বস্তু দ্বারা একাধিক কাজ নিতে হবে। উদাহরণতঃ পিয়ালা থাকলে তাতে

খাবে এবং তা দিয়ে পানি পান করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ একই পাত্রকে কয়েক কাজে ব্যবহার করাকে উত্তম মনে করতেন। যদি গণনায় আসবাবপত্রের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়, তবে তা যুহদের সকল স্তর থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও রসূলে আকরাম (আঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ করা দরকার। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার গদী। ভেতরে খেজুর গাছের ছোবড়া ভর্তি ছিল। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিছানা হয় দু'ভাঁজ করা কম্বল হত, না হয় খেজুরের ছোবড়া ভর্তি চামড়ার গদী।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। তিনি তখন খেজুরের ছোবড়ার রশি দিয়ে তৈরী খাটে শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসলে ওমর (রাঃ) তাঁর পিঠে রশির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে খাত্তাব পুত্র, তোমার চোখে পানি কেন? হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমি রোম ও পারস্য সম্রাটদের কথা ভাবছি, তাদের কাছে অগণিত ধন-দৌলত স্তূপীকৃত রয়েছে। আর আপনার কথাও ভাবছি। আপনি আল্লাহর হাবীব ও মনোনীত রসূল। আপনি কিনা এই মোটা রশির খাটে শয়ন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি কি পছন্দ কর না যে, তাদের জন্যে দুনিয়া হোক আর আমাদের জন্যে আখেরাত?

এক ব্যক্তি হযরত আবু যর (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। এরপর আরয করল ঃ আপনার ঘরে তো কোন আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন ঃ আরও একটি ঘর আছে। ভাল আসবাবপত্র আমি সেখানে পাঠিয়ে দেই। লোকটি বলল ঃ আপনি যতদিন এখানে থাকেন, ততদিন এখানেও কিছু আসবাবপত্র থাকা দরকার। আবু যর বললেন ঃ ঘরের মালিক আমাকে এ ঘরে থাকতে দেবেন না।

রসূলে আকরাম (রাঃ) সফর থেকে ফিরে এসে আদরের দুলালী হযরত ফাতেমার ঘরে যেতে চাইলেন। তাঁর ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানো ছিল এবং তাঁর হাতে রুপার চুড়ি ছিল। তিনি এসব দেখে সেখান থেকেই ফিরে

এলেন। তখন আবু রাফে হযরত ফাতেমার কাছে গেলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে তাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ফিরে যাওয়ার কথা বললেন। অতঃপর আবু রাফে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ পর্দা এবং চুড়ি দেখে ফিরে এসেছি। অতঃপর হযরত ফাতেমা চুড়ি জোড়াটি হযরত বেলালের হাতে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তিনি এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলো বিক্রি করে তার মূল্য আসহাবে সুফ্ফাকে দিয়ে দাও। হযরত বেলাল আড়াই দেরহামে সেগুলো বিক্রয় করে মূল্য সুফ্ফাবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কন্যার ঘরে গমন করলেন।

একরাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে নতুন বিছানা পাতেন। এর আগে তিনি কম্বল দু'ভাঁজ করে তার উপর শয়ন করতেন। সে রাতে তিনি সকাল পর্যন্ত বিনিদ্র অবস্থায় এপাশ-ওপাশ করে কাটান। ভোর হলে হযরত আয়েশাকে বললেন ঃ এ শয্যা সরিয়ে নাও এবং পুরনো কম্বল বিছিয়ে দাও। এটি সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেয়নি।

এমনিভাবে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রাতের বেলায় পাঁচটি অথবা ছয়টি দেরহাম আগমন করল। তিনি সেগুলো থাকতে দিলেন; কিন্তু তাঁর ঘুম এল না। অবশেষে তিনি সেগুলো বিলিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা বলেন ঃ তখন তিনি ঘুমালেন এবং আমি তাঁর নাসিকাধ্বনি শুনতে পেলাম। নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি বললেন ঃ যদি এই দেরহামগুলো আমার কাছে থেকে যেত এবং আমার ওফাত হয়ে যেত, তবে আমার প্রতি আল্লাহর কি ধারণা হত? হযরত হাসান বলেন, আমি সত্তরজন দরবেশকে দেখেছি, যাদের কাছে একটি কাপড় ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের কেউ মাটিতে কোন কাপড় বিছায়নি। যখন ঘুমুতে চেয়েছে, মাটিতে দেহ লাগিয়ে উপরে কাপড় রেখে নিজেকে আবৃত করে নিয়েছে।

(৫) পঞ্চম প্রয়োজন বিবাহ সম্পর্কে কিছু লোকের মত এই যে, মূল বিবাহ এবং বহু বিবাহের মধ্যে যুহদ বলতে কিছু নেই। এটাই সহল তস্তরীর উক্তি। তিনি বলেন ঃ যাহেদকুল শিরমণি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যখন মহিলাদের পছন্দ করতেন, তখন তাদের ব্যাপারে আমরা কেমন করে

যুহদ করতে পারি। এ মতের সপক্ষে হযরত ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে অধিকতর যুহদকারী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর চার স্ত্রী এবং দশজনের অধিক বাঁদী ছিল। এ প্রসঙ্গে সোলায়মান দারানীর উক্তি বিশুদ্ধ। তিনি বলেন ঃ যা কিছু আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে— স্ত্রী হোক অথবা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি—সবই মানুষের জন্যে খারাপ। মাঝে মাঝে মহিলাও আল্লাহ থেকে বাধা দেয়। সেজন্যেই কোন কোন অবস্থায় অবিবাহিত থাকাই উত্তম। তখন বিবাহ না করা যুহদের মধ্যে গণ্য। যে ক্ষেত্রে কাম-প্রবৃত্তি দমন করার জন্যে বিবাহ উত্তম, সেখানে তো বিবাহ ওয়াজিব। সেখানে বিবাহ বর্জন করা কেমন যুহদ হতে পারে? হাঁ, যদি বিবাহ না করার মধ্যে কোন বিপদ না থাকে এবং করলেও কোন দোষ হয় না, তবে আল্লাহর মহব্বতকে ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বিবাহ বর্জন করা যুহদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব যদি জানা যায়, মহিলা আল্লাহর পথে বাধা নয়, এরপরও কেবল দৃষ্টির স্বাদ ও সহবাসের আনন্দ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যদি কেউ বিবাহ বর্জন করে, তবে তা যুহদ নয়। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তান লাভ, যা প্রজন্ম রক্ষা ও উম্মতে মোহাম্মদী বৃদ্ধি করায় সহায়ক ও সওয়াবের কারণ। এতে যে আনন্দ অর্জিত হয়, তা অপরিহার্য ও জরুরী। এটা যদি আসল উদ্দেশ্য না হয়, তবে ক্ষতিকর নয়। উদাহরণতঃ যদি কেউ স্বাদ ও আনন্দ লাভ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রুটি খাওয়া ও পানি পান করা বর্জন করে, তবে তা যুহদ নয়। কেননা, এটা আত্মহত্যার শামিল। এমনিভাবে বিবাহ বর্জন করলে নিজের প্রজন্ম কর্তন করা হয়। সুতরাং কেবল আনন্দ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিবাহ বর্জন করা অনুচিত যে পর্যন্ত অন্য কোন বিপদের আশংকা না থাকে। সহল তস্তরীর উদ্দেশ্য তাই এবং একারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিবাহ করেছিলেন। বহু বিবাহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করত না। এখন কোন ব্যক্তির অবস্থা যদি এরূপ হয়, তবে তার কেবল সহবাসের আনন্দ থেকে বাঁচার জন্যে বিবাহ বর্জন করা কোন ফলপ্রসূ যুহদ নয়। কিন্তু পয়গম্বর ও ওলীগণ ছাড়া এরূপ অবস্থা কার হতে পারে? এখন তো অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে, রমণীদের আধিক্য তাদের মনকে বিমুখ করে দেয়। কাজেই এখন বিবাহ না করাই সমীচীন।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে মহিলা মর্যাদাহীন অথবা এতীম, তাকে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মহিলার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বিবাহ করবে। হযরত জুনায়দ বলেন ঃ আমার পছন্দ মতে মুরীদ প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিষয়ে মন লাগাবে না। নতুবা তার হাল বদলে যাবে। প্রথম পেশা, দ্বিতীয় হাদীস সংগ্রহ এবং তৃতীয় বিবাহ।

(৬) ষষ্ঠ প্রয়োজন ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি, যা উপরোক্ত পাঁচটি প্রয়োজন পূরণ করার উপায়। প্রতিপত্তির অর্থ হচ্ছে মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া, যাতে এর মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কর্মে ব্যবহার করা যায়। যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করতে পারে না এবং অপরের খেদমতের মুখাপেক্ষী, তার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি খেদমতকারীর অন্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং প্রতিপত্তির সূচনা নিঃসন্দেহে সৎ ও সাধু। কিন্তু পরিণামে এটা মানুষকে বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, কাজলের কক্ষে প্রবেশ করলে দাগ লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

মানুষের অন্তরে স্থান করা কোন উপকার লাভের উদ্দেশে হবে, অথবা ক্ষতি দূরীকরণের উদ্দেশে অথবা কারও যুলুম থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে হবে। ধন-সম্পদের উপস্থিতিতে উপকার লাভের প্রয়োজন নেই। কেননা, পারিশ্রমিক নিয়ে যে খেদমত করে, সে খেদমত করবেই অন্তরে প্রভুর মান-মর্যাদা থাক বা না থাক। হাঁ, যে ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে খেদমত করে, তার অন্তরে স্থান করার প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষতি দূরীকরণের উদ্দেশে প্রতিপত্তির প্রয়োজন এমন শহরে হয়, যেখানে ন্যায় বিচারের অভাব থাকে অথবা এমন প্রতিবেশীদের মধ্যে বাস করে, যারা তাকে জ্বালাতন করে এবং সে তাদের অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম হয় না।

প্রতিপত্তির পথে যারা চলে, তারা ধ্বংসের পথের পথিক। যুহদকারীর উচিত কখনও অন্তরে স্থান করার প্রয়াসী না হওয়া। কারণ, তার অন্তর এবাদত ও ধর্মকর্মে নিয়োজিত থাকে। এতেই মানুষের অন্তরে কষ্ট না পাওয়ার মত স্থান হয়ে যাবে— যদিও সে কাফেরদের মধ্যে অবস্থান করে।

সারকথা, অন্তরে স্থান করার প্রয়াস চালানোর অনুমতি কোন অবস্থাতেই নেই। এর অল্প পরিমাণ অধিক পরিমাণের দিকে টেনে নেয় এবং তার অভ্যাস মদের অভ্যাসের চেয়েও কঠোরতর। অতএব, এর অল্প ও বেশী সবকিছু থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ধন-সম্পদ জীবনের জন্যে জরুরী। কিন্তু সামান্য ধন-সম্পদই যথেষ্ট। যদি কোন ব্যক্তি পেশাদার হয়, হবে একদিনের প্রয়োজন পরিমাণে ধন অর্জিত হয়ে গেলে কাজ না করা উচিত। এটা যুহদের জন্যে শর্ত। যদি কেউ এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে ধন উপার্জন করে, তবে যুহদকারীদের ছোট-বড় কোন কাতারেই থাকবে না। যদি কারও কাছে ভূখণ্ড থাকে এবং সে তাওয়াক্কুলে অধিক বিশ্বাসী না হয়, তবে উৎপন্ন ফসল এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে রাখা যুহদ বহির্ভূত হবে না— যদি সে অতিরিক্ত ফসল সদকা করে দেয়। তবে এরূপ ব্যক্তি দুর্বল যুহদকারী বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে এবং নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সে রেশমের পোকার মত। রেশমের পোকা প্রথমে নিজের উপর রেশমের জাল বুনে, এরপর জালের ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে চায়; কিন্তু কোন পথ খুঁজে পায় না। ফলে সেখানেই মরে যায়। এভাবে সে নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয়। এমনি ভাবে যে দুনিয়ার কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, সে নিজের অন্তরকে শৃঙ্খল পরায়। অর্থ, যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন প্রভৃতি হচ্ছে আলাদা আলাদা শৃঙ্খল। এরপর যদি সে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং এগুলোর বেড়াজাল থেকে বের হতে চায়, তবে বের হতে পারে না। কেননা, এসব শৃঙ্খল ছিন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এমনি অবস্থায় মালাকুল মওত এসে তাকে যাবতীয় প্রিয় বস্তু থেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখন তার অবস্থা হয় অত্যন্ত করুণ। একদিকে তার অন্তর থাকে দুনিয়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আর মালাকুল মওতের থাবা তার অন্তরের শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়ে আখেরাতের দিকে টানতে থাকে এবং অপরদিকে দুনিয়ার শিকলগুলো তাকে দুনিয়ার দিকে সজোরে টানতে থাকে। মাঝখানে পড়ে তার অবস্থা এমন হয়, যেমন কোন ব্যক্তির দেহের অর্ধাংশকে করাত দিয়ে চিরার পর দু'দিক থেকে দু'ব্যক্তি ধরে সজোরে টান দেয় এবং পৃথক করে ফেলে।

আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে সে বিষয়টিই ঢুকিয়ে দেন, যা রসূলে করীম (সাঃ)-এর অন্তরে অবস্থান করেছিল। অর্থাৎ, তাঁকে বলা হয়েছিল—

أَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ

অর্থাৎ, আপনি যাকে ইচ্ছা মহব্বত করুন, তবে জেনে রাখুন, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহর ওলীগণ জানতে পেরেছেন যে, মানুষ নিজের খাহেশ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজেকে রেশমের পোকার মত ধ্বংস করে। সে কারণেই তারা দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ আমি বদর যোদ্ধাদের সত্তরজনকে এমন দেখেছি, যারা হালাল বস্তুসমূহে এতটুকু যুহদ করতেন, যতটুকু তোমরা হারাম বস্তুতেও কর না। তোমরা তাদেরকে দেখলে পাগল মনে করতে, আর তারা তোমাদের কোন সাধু ব্যক্তিকে দেখলে বলতেন, ধর্ম-কর্মে তার কোন অংশ নেই। তোমাদের কোন অসৎ লোককে দেখলে বলতেন যে, সে কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না। তাদের সামনে হালাল ধন-সম্পদ পেশ করা হলেও তারা তা গ্রহণ করতেন না। বলতেন ঃ এটা গ্রহণ করলে আমার অন্তর বিগড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

দুনিয়ার মহব্বত যাদের অন্তরকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

رَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُوْنَ -

অর্থাৎ, যারা পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাতেই প্রশান্ত, আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফেল।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا -

অর্থাৎ, সে ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি। সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। সীমালঙ্ঘনই হচ্ছে তার কাজ।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ -

অর্থাৎ, অতএব মুখ ফিরিয়ে নিন সে ব্যক্তি থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই চায় না। এটাই তার বিদ্যার দৌড়।

এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের এই পার্থিব জীবনে ডুবে থাকার কারণ হচ্ছে গাফলতি ও অজ্ঞতা।

যুহদের আলামত ঃ কখনও এরূপ ধারণা হয় যে, ধন-দৌলত বর্জন করলেই যুহদ হবে অথচ বাস্তবে তা নয়। কেননা, যে ব্যক্তি যুহদের উপর মানুষের প্রশংসাকে ভাল মনে করে, তার পক্ষে ধন-সম্পদ বর্জন করা খুবই সহজ। সুতরাং শুধু ধন-দৌলত বর্জন যুহদের অকাট্য প্রমাণ নয়। বরং এর জন্যে ধন ও লোক-প্রশংসা উভয়টি বর্জন করা জরুরী।

সত্য বলতে কি, যুহদ চেনা খুবই কঠিন ব্যাপার। বরং যুহদকারীর কাছেও তার যুহদ সন্দিগ্ধ থাকে। অতএব, যুহদকারীর উচিত নিজের মধ্যে তিনটি আলামতের উপর ভরসা করা। যুহদের প্রথম লক্ষণ হল উপস্থিত বস্তুর জন্যে আনন্দিত না হওয়া এবং যা হাতছাড়া হয়ে যায় তার জন্যে দুঃখ না করা।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ -

অর্থাৎ, তোমাদের হাতে যা আসেনি, তার জন্যে দুঃখ করো না এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন, তার জন্যে উল্লসিত হয়ো না; বরং এর বিপরীত হওয়া উচিত অর্থাৎ, হাতে ধন এলে দুঃখিত হওয়া এবং ধন না এলে আনন্দিত হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় পরিচয় এই যে, যুহদকারীর কাছে নিন্দাকারী ও প্রশংসাকারী উভয়ই সমান হবে। এটা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যুহদ করার আলামত— যেমন, প্রথমটি ধন-দৌলতে যুহদ করার লক্ষণ।

তৃতীয় আলামত হল, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আকর্ষণ থাকা। অন্তরে তাঁর আনুগত্যের মিষ্টতা প্রবল থাকা। কেননা, অন্তর মহব্বতশূন্য থাকে না, তা দুনিয়ার মহব্বত হোক অথবা আল্লাহ তা'আলার মহব্বত। অন্তরে এই উভয় প্রকার মহব্বতের অবস্থা গ্লাসে পানি ও বায়ুর অবস্থার মত। গ্লাসে যখন পানি ঢেলে দেয়া হয়, তখন তার ভেতর থেকে বায়ু বের হয়ে যায়। পানি ও বায়ু একত্রে গ্লাসে থাকে না। যে আল্লাহর প্রতি অনুরাগী, সে তাতেই নিমগ্ন থাকে—অন্য কিছুতে মশগুল হয় না। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গকে যখন প্রশ্ন করা হল, যুহদ যুহদকারীকে কোথায় পৌছায়? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে নিমগ্নতায়। আল্লাহর প্রতি টান ও দুনিয়ার প্রতি টান উভয়টি একত্রিত হতে পারে না। সেমতে মারেফতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ বলেন, যখন ঈমান বাহ্যিক অন্তরে থাকে, তখন মুমিন দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে মহব্বত করে এবং উভয়ের জন্যে কাজ করে। আর যখন ঈমান অন্তরের কাল বিন্দুতে থাকতে শুরু করে, তখন সে দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তার কাজও করে না।

যুহদকারীর জন্যে দু'টি মকামের মধ্য থেকে একটিতে থাকা জরুরী। প্রথম মকাম এই যে, সে নিজের মধ্যে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকবে যে, তার কাছে প্রশংসা ও নিন্দা, ধনাঢ্যতা ও নিঃস্বতা সমান হবে। এই অবস্থায় সামান্য ধন-সম্পদ রাখার কারণে তার যুহদ বিনষ্ট হবে না। ইবনে আবুল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি আবু সোলায়মানকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত দাঊদ তায়ী যাহেদ ছিলেন কিনা? তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ দীনার পেয়ে তা বিশ বছরে ব্যয় করেছিলেন। আবু সোলায়মান বললেন ঃ তিনি অবশ্যই যাহেদ ছিলেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন বস্তু সক্ষমতা সত্ত্বেও কেবল মন ও ধর্মের ভয়ে বর্জন করবে, সে যুহদের সে পরিমাণ অংশই পাবে। আর যুহদের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া সবকিছুকে বর্জন করা, এমনকি পাথরের উপরও মাথা না রাখা, যেমন হযরত ঈসা (আঃ) করেছিলেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে মোনাজাত করি, তিনি যেন আমাদেরকে অন্তত যুহদের প্রাথমিক স্তর নসীব করেন। চূড়ান্ত স্তরসমূহের

লোভ করা আমদের মত লোকদের জন্যে কেমন করে সম্ভবপর?

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, যুহদের আলামত হচ্ছে দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, সম্মান, অপমান এবং প্রশংসা ও নিন্দা সমান হওয়া। এখন জানা দরকার এর আরও অনেক প্রাসঙ্গিক লক্ষণও রয়েছে; যেমন দুনিয়াকে এমনভাবে বর্জন করা যে, সেটা কোথায় গেল, কার কাছে গেল, তার কোন পরওয়া না করা। কারও কারও মতে যুহদের আলামত হচ্ছে দুনিয়াকে যেমন-তেমনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং এরূপ না বলা যে, সরাইখানা তৈরী করা হবে অথবা মসজিদ নির্মাণ করা হবে। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ যুহদের আলামত উপস্থিত বস্তু দান করে দেয়া। হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মন্দকে এক কক্ষে বন্ধ করেছেন এবং দুনিয়ার মহব্বতকে এর চাবি করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি সকল কল্যাণকে এক কক্ষে বন্ধ করে যুহদকে তার চাবি করেছেন।

তাওয়াক্কুল ব্যতিরেকে যুহদ পূর্ণতা লাভ করে না। তাই অতঃপর তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অষ্টম অধ্যায়

দুনিয়ার নিন্দা

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়া আল্লাহর শত্রু, তাঁর ওলীগণের শত্রু এবং তাঁর শত্রুদেরও শত্রু। আল্লাহর শত্রু এ কারণে যে, সে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর পথে চলতে দেয় না; রাহাজানি করে। এ কারণেই যখন থেকে আল্লাহ দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন, তার দিকে কখনও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেননি।

দুনিয়া আল্লাহর ওলীগণের শত্রু এ কারণে যে, সে তাদের সামনে খুব সজ্জিত ও চাকচিক্যময় হয়ে আসে এবং নিজের আলেয়া প্রদর্শন করে, যাতে তারা কোনরূপে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তাদেরকে প্রাণান্তকর সাধনা করতে হয়।

দুনিয়া আল্লাহর শত্রুদের শত্রু এ কারণে যে, সে তাদেরকে ধাপে ধাপে নিজের প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে নেয়। অবশেষে তারা তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে তাদেরকে এমন কাঙ্গাল করে ছাড়ে যে, দুঃখ ও অনুতাপ ছাড়া কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারে না। তারা চিরস্থায়ী সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। দুনিয়ার বিরহ জ্বালার সাথে সাথে আখেরাতের নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ফরিয়াদ করলে এই জওয়াব শুনবে اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ অর্থাৎ, জাহান্নামে থেকে লাঞ্ছিত হও এবং কোন কথা বলো না।

তারা হবে এই আয়াতের প্রতীক—

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

অর্থাৎ, তারাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

দুনিয়ার আপদ-বিপদ ও নষ্টামির যখন এই অবস্থা, তখন প্রথমে দুনিয়া

কাকে বলে, তা চিনা নেহায়েত জরুরী। এ ছাড়া দুনিয়াকে সৃষ্টি করার রহস্য, তার প্রতারণা ও অনিষ্টের পথগুলো জানা অত্যাবশ্যক। নিম্নে আমরা এসব বিষয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে সচেষ্ট হব।

কোরআন মজীদে দুনিয়ার নিন্দা সম্পর্কিত আয়াত অনেক। অধিকাংশ আয়াতে মানুষকে দুনিয়ার দিক থেকে চোখ বন্ধ করে আখেরাতের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যও কেবল এটাই। এদিক দিয়ে আল্লাহর কালাম থেকে সনদ পেশ করার প্রয়োজন নেই। নিম্নে কেবল এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার একটি মৃত ছাগলের কাছ দিয়ে যাবার সময় সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ এই ছাগল তার মালিকের কাছে ঘৃণিত নয় কি? তারা আরয করলেন ঃ ঘৃণিত না হলে কি এখানে ফেলে দিয়েছে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, দুনিয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে এই ছাগলের চেয়েও অধিক ঘৃণিত। যদি দুনিয়া আল্লাহর কাছে একটি মাছির পালকের মত হতও তাহলেও ভাল হত, তবে কাফের এ থেকে এক চুমুক পানিও পেত না।

অন্য হাদীসে আছে— اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ لِلْكَافِرِ অর্থাৎ, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত।

আরও বলা হয়েছে—

اَلدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَافِيهَا اِلَّا مَا كَانَ لِلّٰهِ مِنْهَا -

অর্থাৎ, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে, সেগুলোও অভিশপ্ত; কিন্তু যা আল্লাহর জন্যে, তা স্বতন্ত্র।

হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণিত এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের দুনিয়াকে মহব্বত করে, সে তার আখেরাতের ক্ষতি করে এবং যে আখেরাতকে ভালবাসে, সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করে। অতএব তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর উপর অক্ষয় বস্তুকে অগ্রাধিকার দাও।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

অর্থাৎ, দুনিয়ার মহব্বত যাবতীয় পাপের মূল।

যায়দ ইবনে আকরাম বলেন ঃ আমরা হযরত আবু বকরের সাথে ছিলাম, এমন সময় তিনি পানি চাইলেন। লোকেরা মধুমিশ্রিত পানি এনে উপস্থিত করল। তিনি পানি মুখের কাছে নিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে সঙ্গীরা সকলেই কান্না শুরু করে দিল এবং কেঁদে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু হযরত আবু বকরের কান্না থামল না। অবশেষে সবাই মনে করল, তারা কান্নার কারণও জিজ্ঞেস করতে পারবে না। অতঃপর তিনি চোখ মুছে ফেললেন। লোকেরা আরয করল ঃ হে নায়েবে রসূল (সাঃ), আপনার কাঁদার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় দেখলাম যে, তিনি কাউকে বলছেন—আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যা। অথচ সেখানে কেউ ছিল না। আমি আরয করলাম ঃ হুযুর, আপনি কাঁকে দূর হতে বলছেন? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে দুনিয়া দেহ ধারণ করে আমার সামনে আসে। আমি তাকে বললাম ঃ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যা। এরপর সে আবার আসল এবং বলল ঃ আপনি আমার কাছ থেকে বেঁচে থাকলেও আপনার পরবর্তী লোকেরা বেঁচে থাকবে না।

এক রেওয়ায়েতে আছে—রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার একটি ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে যান এবং সাহাবায়ে কেরামকে বলেন ঃ এস, দুনিয়া দেখে যাও। অতঃপর তিনি ঘোড়ার উপর থেকে একটি পচা বস্ত্র ও গলিত অস্থি হাতে নিয়ে বললেন ঃ এটা দুনিয়া। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়ার সাজসজ্জাও এই বস্ত্রের মত দ্রুত পুরাতন হয়ে যাবে এবং যে সব দেহ দুনিয়াতে লালিত হয়, সেগুলোও এই অস্থির মত গলে যাবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন ঃ দুনিয়াকে প্রভু বানিয়ো না। সে তোমাকে গোলাম বানিয়ে নেবে। নিজের ভাণ্ডার এমন লোকের কাছে গচ্ছিত রাখ, যে আত্মসাৎ না করে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যার ধন-ভাণ্ডার আছে,

তার উপর বিপদ আসার আশংকা থাকে। যার ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর কাছে থাকে, তার কোন বিপদের ভয় নেই। তিনি আরও বলেন ঃ হে আমার অনুচরবৃন্দ, আমি দুনিয়াকে তোমাদের জন্যে উপুড় তথা অধোমুখী করে দিয়েছি। তোমরা যেন আমার পরে একে আবার সোজা করে দাঁড় না করাও। এটা দুনিয়ার একটি নষ্টামি যে, মানুষ এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। অথচ দুনিয়ার মোহ না কাটা পর্যন্ত আখেরাত পাওয়া যায় না। অতএব, দুনিয়াকে সরাইখানা মনে কর এবং মুসাফিরের ন্যায় এতে দিনাতিপাত কর। দালানকোঠা নির্মাণ করো না। মনে রেখ, সকল অনিষ্টের মূল হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। প্রায়ই এক মুহূর্তের কামনা দীর্ঘকালীন দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। এটাও তাঁরই উক্তি যে, তোমাদের জন্যে দুনিয়া অধোমুখী হয়ে পড়ে আছে। তোমরা তার পিঠে বসে আছ। অতএব, দুনিয়ার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ ও মহিলারা যেন তোমাদের মোকাবিলা না করে। অর্থাৎ রাজা-বাদশাহদের সাথে দুনিয়ার জন্যে কলহ করো না। কেননা, তাদের প্রতি এবং তাদের দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মোহ না থাকলে তারা তোমাদের কোন ক্ষতিসাধন করবে না। মহিলাদের কাছ, থেকে আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে নামায-রোযা।

হযরত ঈসা (আঃ) আরো বলেন ঃ দুনিয়া স্বয়ং কিছু লোকের অন্বেষণ করে এবং কোন কোন লোক দুনিয়াকে অন্বেষণ করে। যারা আখেরাতের জন্যে কাজ করে, দুনিয়া সারাজীবন তাদের অন্বেষণ করে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ার অন্বেষণ করে; আখেরাত মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে আহ্বান করে।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান ইবনে দাঊদ (আঃ) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক আবেদের কাছে যান। তাঁর সাথে ছিল সৈন্যসামন্ত। ডানে ও বামে মানুষ ও জিনের সারি ছিল। এ দৃশ্য দেখে আবেদ আরয করলঃ হে সোলায়মান. আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন। সোলায়মান (আঃ) বললেনঃ একবার "সোবহানাল্লাহ" উচ্চারণ করা মুমিনের আমলনামায় এসকল জাঁকজমক অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এই জাঁকজমক ধ্বংসশীল; কিন্তু আল্লাহর যিকর সর্বক্ষণ সাথে থাকবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন

أَلْهَٰكُمُ التَّكَاثُرُ অর্থাৎ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে

দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ বলে, এটা আমার, ওটা আমার। অথচ তার ততটুকুই যতটুকু সে খেয়ে শেষ করে দেয়, পরে উড়িয়ে দেয় অথবা খয়রাত করে সঞ্চিত করে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন— রসূলে করীম (সাঃ) একদিন আমাকে বললেনঃ আমি তোমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত বস্তুসমূহ দেখাব। আমি আরয করলামঃ খুব ভাল কথা। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মদীনার একটি জঙ্গলে গেলেন। জঙ্গলের এক জায়গায় মৃত মানুষের মাথার খুলি, পায়খানা, হাড়গোড় ও ছিন্নবস্ত্র ছিল। তিনি বললেনঃ হে আবু হুরায়রা, এসব খুলি তেমনি আকাঙ্ক্ষা করত, যেমন তুমি কর এবং তেমনি আশা করত, যেমন তুমি কর; কিন্তু আজ এমন হয়ে গেছে যে, এগুলোর উপর চামড়া পর্যন্ত নেই। কিছুদিনের মধ্যেই এগুলো ভস্ম হয়ে যাবে। এই যে পায়খানা দেখছ, এগুলো তাদের খাদ্য ছিল। খোদা জানে কোথা থেকে উপার্জন করে খেয়েছিল। আজ এমন হয়ে গেছে যে, তোমার ঘৃণা হয়। আর এই ছিন্নবস্ত্র ছিল তাদের পোশাক। বায়ু একে এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে ফিরে। আর এই পায়ের হাড়গুলো তাদের চতুষ্পদ জন্তুর, যেগুলোর পিঠে চড়ে তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে যেত। ক্ষণভঙ্গুর দুনিয়ার যখন এই পরিণতি, তখন এটা শিক্ষা গ্রহণেরই স্থান।

হযরত দাঊদ ইবনে হেলাল বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফায় লিখিত আছে— হে দুনিয়া, তুই সৎকর্মপরায়ণদের কাছে অত্যন্ত লাঞ্ছিত, যাদের সামনে তুই সেজেগুঁজে গমন করিস। আমি তাদের অন্তরে তোর প্রতি শত্রুতা স্থাপন করেছি। তোর চেয়ে অধিক বিকৃত আমি কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। তোর প্রতিটি অবস্থা ঘৃণ্য যোগ্য। শেষ পর্যন্ত তুই ফানা হয়ে যাবি। যেদিন আমি তোকে সৃষ্টি করেছি, সেদিনই নির্দেশ দিয়েছি যে, তুই কারও কাছে থাকবি না এবং কেউ তোর কাছে থাকবে না। সুসংবাদ সেই সৎলোকদের জন্যে, যাদের অন্তরে সন্তুষ্টি এবং মনে সততা ও দৃঢ়তা বিদ্যমান। আমার কাছে তাদের প্রতিদান ও সওয়াব এই যে. তারা কবর থেকে উঠে যখন আমার দিকে ধাবিত হবে, তখন তাঁদের আগে আগে নূর থাকবে। তাদের আশেপাশে ফেরেশতারা থাকবে। আমার কাছে তারা যে পরিমাণ রহমত আশা করবে, আমি সে পরিমাণ দেব।

হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনীতে বর্ণিত আছে, যখন তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করলেন, তখন তাঁর পেটে গোলমাল দেখা দিল এবং পায়খানার প্রয়োজন হল। এমন প্রতিক্রিয়া জান্নাতের অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ছিল না। কেবল এই বৃক্ষের মধ্যেই এই প্রতিক্রিয়া নিহিত ছিল এবং একারণেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি পায়খানার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। জনৈক ফেরেশতাকে আদেশ করা হল— আদমকে জিজ্ঞাসা কর সে কি চায়? আদম বললেন ঃ আমার পেটে যে বিপদ দেখা দিয়েছে, তা কোথাও ফেলে দিতে চাই। ফেরেশতা খোদায়ী ইঙ্গিত অনুযায়ী বলল ঃ এখানে কোন্ জায়গাটি এর উপযুক্ত? এখানে তো কেবল ফরশ, সিংহাসন, নির্ঝরিণী এবং বৃক্ষসমূহের মনোরম ছায়া। এগুলোর মধ্যে কোনটিই একাজের উপযুক্ত নয়। এজন্যে দুনিয়াতে যাও।

এক হাদীসে বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন কিছু লোক মক্কার পাহাড়সমূহের সমান আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কি নামাযীও হবে? তিনি বললেনঃ হাঁ, তারা নামাযী হবে, রোযাদার হবে এবং রাতের কিছু অংশ জেগে এবাদতও করবে। কিন্তু তাদের অপরাধ এই যে, যখন দুনিয়ার কোন বস্তু তাদের সামনে আসত, তখন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—মুমিনের অন্তরে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মহব্বত একত্রিত হতে পারে না; যেমন এক পাত্রে আগুন ও পানি একত্রিত হতে পারে না। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-কে বললেনঃ আপনি পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বাধিক বয়স পেয়েছেন। বলুন তো, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আপনি দুনিয়াকে কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেনঃ আমার মনে হয়েছে একটি ঘরের দু'টি দরজা। আমি এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে এসেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ তোমরা দুনিয়া থেকে সাবধান থাক। কেননা, দুনিয়া হারূত ও মারূতের চেয়েও বড় জাদুকর।

হযরত হাসান বর্ণনা করেন— একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে এসে বলতে লাগলেনঃ তোমাদের কেউ কি কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে চক্ষুষ্মান করে দেবেন এবং অন্ধত্ব দূর করে দেবেন? জেনে রাখ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবে এবং তাতে দীর্ঘ আশা করবে, আল্লাহ সে পরিমাণে তাকে অন্ধ করবেন। পক্ষান্তরে যে নিজের আমল সংক্ষিপ্ত করবে এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকেই জ্ঞান দান করবেন এবং কারও নির্দেশনা ছাড়াই হেদায়েত দান করবেন। স্মরণ রেখো, তোমাদের পরে সত্বরই এমন লোক সৃষ্টি হবে, যাদের কাছে খুন-খারাবী ছাড়া রাজত্ব থাকবে না, গর্ব ও ঔদ্ধত্য ছাড়া ধনাঢ্যতা থাকবে না এবং স্বার্থ ছাড়া মহব্বত থাকবে না। অতএব, তোমাদের যে ব্যক্তি সে সময়টি পাবে এবং ধনাঢ্যতায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যে সবর করবে, প্রতিশোধ গ্রহণ ও সম্মান লাভের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শত্রুতা ও লাঞ্ছনা সহ্য করবে এবং সবর ও সহনশীলতা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে পঞ্চাশ জন সিদ্দীকের সওয়াব দান করবেন।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ)- কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন। আনসাররা তার আগমনের সংবাদ শুনে সবাই ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শরীক হন। নামাযান্তে তিনি যখন ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আনসাররা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেনঃ আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ আবু ওবায়দা কিছু ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছে। তারা আরয করল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা সুখী হও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কষ্ট দূর করেছেন। আমি এটা আশংকা করি না যে, তোমরা নিঃস্ব হয়ে যাবে ; বরং ভয় এই যে, কোথাও তোমাদের উপর দুনিয়ার প্রাচুর্য এমন না হয়ে যায়, যেমন পূর্ববর্তীদের উপর হয়েছিল। তোমরাও না তাদের মত দুনিয়াতে ডুবে যাও। এরপর দুনিয়া তাদের মত তোমাদেরকেও না ধ্বংস করে দেয়!

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের উপর যে বিষয়ের বেশী ভয় করি, তা সেই বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে বের করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর বরকত।

লোকেরা আরয করল ঃ পৃথিবীর বরকত কি? তিনি বললেন ঃ

زُبْدَةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ, দুনিয়ার নির্যাস।

আম্মার ইবনে সায়ীদ রেওয়ায়েত করেন—হযরত ঈসা (আঃ) একবার এক গ্রামের উপর দিয়ে যাবার সময় গ্রামের অধিবাসীদেরকে বারান্দায় ও রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি অনুচরবর্গকে বললেনঃ নিশ্চয় এরা আল্লাহ তা'আলার গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তা নাহলে একে অপরকে দাফন করত। অনুচররা বললঃ এরা কেন মারা গেল তা জানতে পারলে আমাদের খুব উপকার হত। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে এ তথ্য জানতে চাইলে এরশাদ হল ঃ রাতের বেলায় এদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো। জওয়াব পাবে। সে মতে রাত হলে হযরত ঈসা (আঃ) টিলার উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিলেনঃ গ্রামবাসীগণ! তাদের একজন জওয়াব দিল ঃ কি বলেন, হে রূহুল্লাহ। তিনি বললেনঃ তোমাদের এই অবস্থা কেন? সে জওয়াব দিল ঃ সন্ধ্যায় সুস্থ অবস্থায় শুয়েছিলাম। ভোরে দোযখে পতিত হলাম। আমরা দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত ছিলাম এবং পাপীদের আনুগত্য করতাম। ঈসা (আঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা দুনিয়াকে কতটুকু মহব্বত করতে? উত্তর হল ঃ যতটুকু শিশু তার জননীকে মহব্বত করে। জননী সামনে থাকলে সে আনন্দিত হয় এবং আড়ালে চলে গেলে দুঃখিত হয়ে কাঁদতে থাকে। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তোমার সঙ্গীরা জওয়াব দেয় না কেন? জওয়াব এল ঃ কারণ, তাদের মুখে আগুনের লাগাম রয়েছে। সে লাগাম কড়া মেযাজের ফেরেশতারা ধরে রেখেছে। তিনি জিজ্ঞেস

করলেন ঃ তবে তুমি কিরূপে কথা বলছ? উত্তর হল ঃ আমি তাদের মত কাজ করতাম না। কিন্তু তাদের সাথে বসবাস করার কারণে আযাব আমাকেও ছাড়েনি। এখন আমি দোযখের কিনারায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছি। জানি না, দোযখ থেকে রক্ষা পাব, না তাতে নিক্ষিপ্ত হব। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) অনুচরবর্গকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হতে পারলে যবের রুটি মোটা লবণ দিয়ে খাওয়া, চট পরিধান করা এবং ময়লা-আবর্জনার উপর ঘুমিয়ে পড়া অনেক ভাল।

কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যাতে আমি আল্লাহকে মহব্বত করতে শুরু করি। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে শত্রুতা কর, আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করবেন। হযরত আবু দারদার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا أَوْلَهَانَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا وَلَاثَرْتُمُ الْآخِرَةَ -

অর্থাৎ, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। দুনিয়া তোমাদের কাছে লাঞ্ছিত হত এবং তোমরা আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যার মধ্যে ছয়টি বিষয় বিদ্যমান থাকে, সে জান্নাত লাভের জন্যে কোন কাজ বাকী রাখেনি এবং জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোন ত্রুটি অবশিষ্ট রাখেনি। এক, আল্লাহকে চিনে তার আনুগত্য করা। দুই, শয়তানকে চিনে তার অবাধ্যতা করা। তিন, সত্যকে চিনে তার অনুসরণ করা। চার, বাতিলকে জেনে তার থেকে বেঁচে থাকা। পাঁচ,দুনিয়া সম্পর্কে জেনেশুনে তাকে বর্জন করা। ছয়, আখেরাতের যথার্থতা বুঝে তা অন্বেষণ করা।

হযরত লোকমান তার পুত্রকে বলেন ঃ দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র। এতে অনেক মানুষ নিমজ্জিত হয়েছে। তুমি দুনিয়াতে খোদাভীতিকে নিজের নৌকা বানাও। তাতে ঈমানকে রাখ এবং তাওয়াক্কুলের পাল তুল,

যাতে ঢেউ থেকে মুক্তি পেতে পার। তবে মুক্তি যে পাবেই তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

এক ব্যক্তি আবু হাশেমের কাছে এই বলে দুনিয়ার মহব্বতের অভিযোগ করল যে, আমি দুনিয়াতে থাকব না— এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বত আমার ভেতরে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দেন, তা হালাল পথে আসে কি না, তা দেখে নেবে। এরপর সেটা উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করবে। এরূপ করলে দুনিয়ার মহব্বত ক্ষতি করবে না। একথা বলার কারণ এই যে, কেবল মহব্বতের কারণেই শাস্তি হলে মহাবিপদ হবে এবং মানুষ অনন্যোপায় হয়ে মৃত্যু কামনা করতে থাকবে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি দুনিয়া সোনার তৈরী হত এবং ধ্বংস হয়ে যেত, আখেরাত মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা হতো এবং অক্ষয় থাকতো, তবে বুদ্ধিমানদের জন্যে অক্ষয়কেই পছন্দ করা সমীচীন হত; যদিও এখন ধ্বংসশীল দুনিয়াই মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরা আর অক্ষয় আখেরাত স্বর্ণের।

হযরত ইবনে মসঊদ বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ মেহমান এবং তার ধন-সম্পদ আমানত। মেহমান একদিন বিদায় হয়ে যাবে এবং আমানত মালিকের হাতে ফিরে যাবে।

হযরত রাবেয়ার কাছে তাঁর জনৈক মুরীদ সার্বক্ষণিক থাকার উদ্দেশ্যে হাযির হল এবং দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে তার নিন্দা করতে লাগল। তিনি বললেন ঃ চুপ কর। দুনিয়ার আলোচনা করো না। তোমার অন্তরে তার জায়গা না থাকলে তুমি এত বেশী আলোচনা করতে না। বলা বাহুল্য, মানুষ যে বস্তুকে মহব্বত করে, তার আলোচনাই বেশী করে।

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ যদি তুমি দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে দিয়ে দাও, তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহান লাভ হবে। আর আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে দিয়ে দিলে উভয় জাহানে লোকসান হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। একভাগ মুমিনের জন্যে, একভাগ মুনাফিকের জন্যে এবং একভাগ কাফেরের জন্যে। মুমিন তার অংশকে আখেরাতের সম্বল করে। মুনাফিক বাহ্যিক সাজ-সজ্জা করে। কাফের তার দ্বারা কামিয়াব হয়।

হযরত আবু ওসামা বাহেলী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন প্রেরিত হন, তখন শয়তানের বাহিনী শয়তানের কাছে এসে বলল ঃ নবী প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর উম্মত আত্মপ্রকাশ করেছে। শয়তান জিজ্ঞেস করল ঃ তাঁর উম্মতের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত আছে কি? উত্তর হল ঃ হ্যাঁ, দুনিয়ার মহব্বত আছে! সে বলল ঃ দুনিয়ার মহব্বত থাকলে মূর্তিপূজা না করলে কি হবে? এখনও তিন পন্থায় তাদের কাছে আমার সকাল-সন্ধ্যায় আনাগোনা হবে। প্রথম, অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়, অস্থানে তা ব্যয় করা। তৃতীয়, ব্যয় করার প্রকৃত স্থান থেকে ফিরিয়ে রাখা। এগুলো এমন বিষয় যে, সমস্ত কুকর্ম এরই পেছনে চলে।

হযরত আলী (রাঃ)-কে কেউ দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সুদীর্ঘ বর্ণনা করব, না সংক্ষেপে? প্রশ্নকারী বলল ঃ সংক্ষেপে। তিনি বললেন ঃ দুনিয়ায় যা হালাল, তার হিসাব দিতে হবে এবং যা হারাম, তার আযাব সহ্য করতে হবে।

হযরত আবু মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ এই জাদুকর অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বেঁচে থেকো। সে আলেমদের অন্তরে জাদু করে। কিন্তু এটা অন্তরে থাকলে আখেরাত তাতে থাকে না। কারণ, আখেরাত সম্ভ্রান্ত আর দুনিয়া নীচ। নীচের সাথে সম্ভ্রান্ত থাকতে পারে না। এ উক্তিটি অত্যন্ত কঠোর। আমাদের মনে হয় এ সম্পর্কে হযরত ইয়াসার ইবনে হাকামের উক্তি অধিক বিশুদ্ধ। তিনি বলেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি একত্রে থাকে। একটি প্রবল হলে অপরটি তার অনুসারী হয়ে যায়।

হযরত মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ যতই দুনিয়া লাভের জন্যে চিন্তা করবে, ততই আখেরাতের চিন্তা অন্তর্হিত হয়ে যাবে এবং যতই আখেরাতের চিন্তা করবে, ততই দুনিয়ার চিন্তা মন থেকে সরে যাবে। এ উক্তিটি হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি থেকে নির্গত। তিনি বলেন ঃ দুনিয়া এবং আখেরাত হল দুই সতীন। একজন যে পরিমাণে তুষ্ট হবে, অপরজন সে পরিমাণে রুষ্ট হবে।

হযরত হাসান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা এমন সব মনীষী

পেয়েছি, যাদের কাছে দুনিয়া পায়ের ধুলোর চেয়েও ঘৃণিত ছিল। দুনিয়া কোন্ দিক থেকে এল এবং কোন্ দিকে চলে গেল, কার কাছে রইল এবং কার কাছে চলে গেল— এসব বিষয় তারা আদৌ পরোয়া করতেন না। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেন, সে যদি সেই ধন-সম্পদ খয়রাত, আত্মীয় এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে ব্যয় করার পর নিজের ভোগ-বিলাসেও ব্যয় করে, তবে তা জায়েয হবে কি না? তিনি বললেন ঃ না। যদি সমগ্র দুনিয়াও তার হয়ে যায়, তবু নিজের জন্যে প্রয়োজন পরিমাণই ব্যয় করবে। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ তার অভাবের দিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের জন্যে রেখে দেবে।

হযরত ফুযায়ল বলেন ঃ যদি সমস্ত দুনিয়া হালাল উপায়ে আমার কবযায় চলে আসে এবং তার হিসাব-কিতাবও আখেরাতে আমার কাছ থেকে না নেয়া হয়, তবু আমি তাকে অপবিত্রই মনে করব; যেমন তোমরা মৃতকে অপবিত্র মনে কর এবং তা থেকে আঁচল বাঁচিয়ে চল।

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন সিরিয়ায় গমন করেন, তখন হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে একটি উষ্ট্রীতে সওয়ার হয়ে আসেন, যার লাগাম ছিল দড়ির। হযরত ওমর তাঁর ঘরে চলে যান। তিনি সেখানে ঢাল, তরবারি ও উষ্ট্রীর গদি ছাড়া আর কিছুই না দেখে বললেন ঃ ঘরের আসবাবপত্র তৈরী করে নিলে ভাল হয় না? হযরত আবু ওয়ায়দা আরয করলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন, এই আসবাবপত্র আমাকে চির নিদ্রার কক্ষে পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট।

এ ঘটনা তখনকার, যখন আবু ওবায়দা সিরিয়ার উদ্দেশে প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং সিরীয় খৃষ্টানদের আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত ওমর সন্ধির কথাবার্তা চূড়ান্ত করার জন্যে সেখানে গমন করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে— মুসলিম বাহিনীর সকল অধিনায়কই হযরত ওমরের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আবু ওবায়দা তা করেননি। হযরত ওমর তাকে বললেন ঃ আমি আপনার বাসস্থান দেখতে চাই। তিনি আরয করলেন ঃ আপনি আমার ঘরে গিয়ে কাঁদবেন। খলীফা বললেন, কোন অসুবিধা নেই। সেমতে ঘরে পৌঁছে তিনি কেবল তরবারি, ঢাল ও বসার জন্য একটি মাত্র চাটাই দেখতে পান।

এছাড়া ছিল পানির একটি মৃৎপাত্র। এই বৈরাগ্য দেখে খলীফার কান্না এসে গেল। আবু ওবায়দা আরয করলেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আমার ঘরে গিয়ে আপনি কাঁদবেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত। আমার সহচরদের মধ্যে তুমিই পূর্ববর্তী তরীকায় কায়েম রয়েছ। অন্যান্য সকলের কাছ থেকে দুনিয়া কিছু না কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

মোটকথা, এই মনীষীগণই দুনিয়াকে কিছু চিনতে পেরেছিলেন। তাঁরা খোদায়ী বিধানাবলীকে অন্তর দিয়ে সত্য জ্ঞান করতেন এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর অনুসরণে পাগলপারা ছিলেন। হযরত সুফিয়ান ছওরী বলেন ঃ দুনিয়াকে দেহের জরুরী সুখ ও আরামের জন্যে এবং আখেরাতকে অন্তরের শান্তির জন্যে গ্রহণ করা উচিত।

হযরত হাসান বলেন ঃ বনী ইসরাঈল আল্লাহ-পূজার পর মূর্তিপূজা অবলম্বন করেছিল। এর একমাত্র কারণ ছিল দুনিয়ার মহব্বত।

হযরত ওয়াহহাব বলেন ঃ আমি এক কিতাবে পাঠ করেছি, দুনিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে সুবর্ণ সুযোগ এবং মূর্খের জন্যে গাফলতির কারণ। অর্থাৎ, জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়াকে সৎকর্ম করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে আর মূর্খ তা বুঝে না। সে যখন এখান থেকে ইন্তেকাল করে, তখন ফিরে আসার বাসনা করে। কিন্তু ফিরে আসা সম্ভব কোথায়!

হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণের পর থেকেই সে ক্রমশ সরে যাচ্ছে এবং আখেরাত সামনে এগিয়ে আসছে। সুতরাং নিজেকে নিকটবর্তী ও সম্মুখবর্তী জায়গায় পৌঁছানো উচিত। দূরবর্তী জায়গায় লাভ কি?

হযরত আমর ইবনে আস একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে এরশাদ করলেন ঃ যে বস্তুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনাসক্তি প্রকাশ করতেন, আমি তাতে তোমাদেরকে অধিক আগ্রহী দেখতে পাই। আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর দিয়ে কখনও এমন তিন দিন অতিবাহিত হয়নি, যাতে তাঁর আমদানী দেনার চেয়ে বেশী থাকত।

হযরত হাসান (রাঃ) একবার এই আয়াতখানি পাঠ করলেন ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

অতঃপর বললেন ঃ জান, এটা কার উক্তি? এ হল তাঁর উক্তি যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। অতএব দুনিয়ার অবস্থা তিনিই ভাল জানেন। তোমাদের উচিত দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে দূরে সরে যাওয়া। এতে অনেক কাজ-কারবার থাকে। এক কাজের মুখোমুখি হলে আরও দশটি কাজ সামনে এসে যায়।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর কাছে একবার নাজরান থেকে একজন লোক এল। তার বয়স ছিল দুশ' বছর। তিনি লোকটিকে দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলল ঃ কয়েক বছর বিপদে কেটেছে এবং কয়েক বছর আরামে। দিবারাত্র এভাবেই অতিবাহিত হয়। যারা জন্মগ্রহণ করার, তারা জন্মগ্রহণ করে এবং যারা মরার, তারা মরে যায়। যদি কেউ জন্মগ্রহণ না করে, তবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ না মরলে দুনিয়াতে স্থান সংকুলান হবে না। হযরত মোয়াবিয়া বললেন ঃ তোমার যা মনে চায়, আমার কাছে প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে। লোকটি আরয করল ঃ আপনি আমার অতীত জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন অথবা ভবিষ্যত মৃত্যু প্রতিরোধ করতে পারেন? খলীফা বললেন ঃ এ দুটির কোনটিই সম্ভব নয়। সে আরয করল ঃ তা হলে আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

দাউদ তায়ী বলেন ঃ হে মানুষ, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে আনন্দিত হও; অথচ জান না, আয়ু বিনষ্ট করে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। তুমি আমল করার ব্যাপারে আজ কাল কর। মনে হয় উপকার অন্য কেউ পাবে।

আবু হাশেম বলেন ঃ দুনিয়াতে এমন কোন খুশী নেই, যার সাথে দুঃখ নেই।

হযরত হাসান বলেন ঃ মানুষের প্রাণবায়ু দুনিয়ার তিনটি বেদনা নিয়ে বের হয়। এক, যা সঞ্চয় করেছিল, তাতে অতৃপ্তির বেদনা। দুই, বাসনা অপূর্ণ থাকার বেদনা। তিন, আখেরাতের সম্বল পুরোপুরি না থাকার বেদনা।

দুনিয়ার অবস্থা ঃ জানা উচিত যে, দুনিয়া অত্যন্ত দ্রুতগামী। সে

প্রত্যেককে স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ প্রত্যেকের মুখে মুখে। বাহ্যত স্থির মনে হয়; অথচ দ্রুতগতিতে তাড়াহুড়া করে পালিয়ে যাচ্ছে। তার গতিশীলতা দেখে বুঝা যায় না; কিন্তু বছর ও মাসের সমাপ্তি দ্বারা অনুভূত হয়। দুনিয়া ছায়ার মত। ছায়াকেও দৃশ্যত গতিশীল মনে হয় না; কিন্তু বাস্তবে গতিশীল থাকে। বুযুর্গগণও দুনিয়াকে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর সামনে দুনিয়ার আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ দুনিয়া পড়ন্ত ছায়া অথবা বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন। দুনিয়া তার কল্পনা দ্বারা মানুষকে ধোকা দেয় এবং দুনিয়া থেকে বের হওয়ার পর সঙ্গে কিছুই থাকে না। তাই দুনিয়াকে স্বাপ্নিক কল্পনার সাথে তুলনা করা হয়। হাদীসে আছে—

اَلدُّنْيَا حُلْمٌ وَاَهْلُهَا عَلَيْهَا مُجَازُوْنَ وَمُعَاتَبُوْنَ

অর্থাৎ., দুনিয়া একটি স্বপ্ন। দুনিয়াবাসীদেরকে প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে।

ইউনুস ইবনে ওবায়দ বলেন ঃ আমার মতে দুনিয়া এমন, যেমন কোন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন খারাপ অথবা সুখবর বিষয় দেখে দুঃখিত অথবা আনন্দিত হয়। মানুষও এমনিভাবে যেন স্বপ্নে দুনিয়ার সুখ ও দুঃখ দেখে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর যখন তাদের চোখ খুলবে, তখন কিছুই পাবে না।

দুনিয়া তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের প্রাণের শত্রু এবং তাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে। এদিক দিয়ে সে সেই নারীর মত, যে পুরুষদের জন্যে প্রচুর অঙ্গসজ্জা করে। এরপর যখন কারও সাথে বিবাহ হয়, তখন তাকে হত্যা করে। দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ। প্রথম প্রথম তাকে খুব সুশ্রী, কোমল ও লাজুক মনে হয়; কিন্তু অবশেষে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সামনে দুনিয়া একজন ফোকলা বৃদ্ধার আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধার গায়ে সর্বপ্রকার অলংকার ও মূল্যবান গহনাগাটি শোভা পাচ্ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ পর্যন্ত তোর কয়জন স্বামী হয়েছে? সে বলল ঃ সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তিনি প্রশ্ন রাখলেন ঃ তারা সকলেই তোকে ছেড়ে মারা

গেছে, না তোকে তালাক দিয়েছে? সে আরয করল ঃ আমি তাদের হত্যা করেছি। ঈসা (আঃ) বললেন ঃ তা হলে তো তোর বর্তমান স্বামীদের দুর্ভোগ বলতে হবে। তারা পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। তুই এক একজনকে খতম করছিস, অথচ তারা তোকে ভয় করে না।

যেহেতু দুনিয়ার বহির্ভাগ এক রকম এবং ভিতরভাগ অন্য রকম, তাই দুনিয়াকে এমন এক কুশ্রী বৃদ্ধার সাথে তুলনা করা যায়, যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, চমকপদ্র পোশাক এবং অলংকার পরে গায়ে বোরকা জড়িয়ে মানুষকে তন্বী যুবতী বলে ধোকা দেয়। মানুষ যখন তার ভেতরের অবস্থা জানতে পারে এবং মুখের উপর থেকে ঘোমটা খুলে দেখে, তখন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়।

আলা ইবনে যিয়াদ বলেন ঃ আমি স্বপ্নে এক বৃদ্ধাকে দেখলাম, যার গায়ের ত্বক বার্ধক্যের কারণে কুঞ্চিত ছিল। সে মূল্যবান পোশাক ও অলংকার পরেছিল। লোকজন তার চার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখে যাচ্ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে দেখতে লাগলাম। এতে সকলই বিস্মিত হল। অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ তুমি আমাকে চিন না? আমি বললাম ঃ না। সে বলল ঃ যদি আমার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে চাও, তবে টাকা পয়সাকে অশুভ মনে করবে।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহঃ) বলেন ঃ আমি বাগদাদ পৌছার পূর্বে দুনিয়াকে স্বপ্নে এক অস্থি কংকালসার বৃদ্ধার আকৃতিতে দেখলাম। সে হাততালি দিচ্ছিল এবং লোকজন তার পেছনে হাততালি দিয়ে নৃত্য করছিল। বৃদ্ধা আমার সামনে এসে আমাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ সুযোগ পেলে আমি তোমার অবস্থাও তাদের মত করব। এ স্বপ্নটি বর্ণনা করে আবু বকর কেঁদে ফেললেন।

ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে এক কুশ্রী, বিবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট বৃদ্ধার আকারে উপস্থিত করা হবে। তার দাঁত সামনের দিকে বের হয়ে থাকবে। তাকে মানুষের সামনে রেখে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তোমরা কি এ বৃদ্ধাকে চিন? তারা আরয করবে ঃ এর পরিচয় থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়

চাই। এরশাদ হবে ঃ এই হল সে দুনিয়া, যার জন্যে তোমরা গর্ব, অহংকার শত্রুতা ও প্রতারণা করতে এবং তার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলে। এরপর বৃদ্ধাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সে আরয করবে ঃ ইলাহী, আমার অনুসরণকারীরা কোথায়? আদেশ হবে ঃ তাদেরকেও তার সঙ্গী করে দাও।

মানুষ দুনিয়া অতিক্রম করে ঠিক; কিন্তু বাস্তবে তার কোন যথার্থতা নেই। কেননা, মানুষের তিন অবস্থা। প্রথম, সেই সময়কাল, যাতে সে জন্মগ্রহণ করেনি; অর্থাৎ আদিকাল থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়। দ্বিতীয়, মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত সময়। এতে সে দুনিয়াকে দেখে না। তৃতীয়, জীবদ্দশার সময়, যাকে দুনিয়া বলা হয়। যদি জীবদ্দশার এই সময়কে আদি ও অনন্তকালের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা এক দীর্ঘ সফরের সামান্য একটু স্থানের সমানও হবে না। সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَالِيْ وَالدُّنْيَا وَاِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ سَارَ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَرُفِعَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فَقَالَ تَحْتَ ظِلِّهَا سَاعَةً ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا -

অর্থাৎ, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন অশ্বারোহী গ্রীষ্মের খরতাপে পথ অতিক্রম করে। এরপর সে একটি বৃক্ষ পেয়ে তার ছায়ায় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর তা পরিত্যাগ করে আবার নিজের গন্তব্য পথে রওয়ানা হয়ে যায়।

কোন ব্যক্তি দুনিয়াকে এই দৃষ্টিতে দেখলে সে কখনও তার প্রতি আগ্রহী হবে না এবং এর দিনগুলো সুখে অতিবাহিত হচ্ছে, কি দুঃখে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। সে ইটের উপর ইট রেখে গৃহ নির্মাণ করবে না। দুনিয়ার অবস্থা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্যক জানা ছিল বিধায় তিনি সারা জীবন ইটের ঘর নির্মাণ করেননি— কাঠেরও নয়। বরং কোন কোন সাহাবীকে কাঠের ঘর নির্মাণ করতে দেখে এরশাদ করেছেন—

اَرَى الْاَمْرَ اَعْجَلَ مِنْ هٰذَا

অর্থাৎ, আমি জীবনটাকে দেখছি এর চেয়ে দ্রুত বিলীয়মান।

হযরত ঈসা (আঃ)-ও এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ দুনিয়া একটি পুল। একে অতিক্রম করে যাও। এতে দালান-কোঠা তৈরী করো না। এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত পরিষ্কার। কেননা, জীবন হচ্ছে আখেরাতে পৌঁছার একটি পুল। এর এক স্তম্ভ হচ্ছে দোলনা এবং অপর স্তম্ভ কবর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সীমিত। কোন কোন লোক এই পুলের অর্ধেক অতিক্রম করেছে। কেউ এক-তৃতীয়াংশ, কেউ দুই-তৃতীয়াংশ এবং কারও এক কদমই অতিক্রম করা বাকি আছে, কিন্তু সে তা জানে না। মোটকথা, এই পুল অতিক্রম করা জরুরী। পুলের উপর দালান নির্মাণ করা এবং নানা প্রকার সজ্জায় সজ্জিত করা এরপর তা ছেড়ে চলে যাওয়া একান্তই নির্বুদ্ধিতা।

দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা খুব সহজ ও কোমল বিধায় দুনিয়াদার মনে করে. দুনিয়া থেকে সহি-সালামতে বের হয়ে যাওয়াও তেমনি সহজ ও আনন্দদায়ক হবে। অথচ ব্যাপার তা নয়। এর জালে আবদ্ধ হওয়া খুব সহজ এবং সহি-সালামতে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এর দৃষ্টান্ত হযরত আলী (রাঃ) সালমান ফারেসীকে লিখিছেন যে, দুনিয়া সাপের মত। তাতে হাত লাগালে বাহ্যত নরম ও মসৃণ মনে হয়; কিন্তু তার বিষ মানুষের জীবন নাশ করে। অতএব, দুনিয়ার যে বস্তু তোমার ভাল লাগে, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। কারণ, তা তোমার হাতে খুব কম থাকবে। দুনিয়ার সর্বাধিক আনন্দের বিষয়টি সর্বাধিক ভয়ের কারণ। কেননা, দুনিয়াতে যখনই কেউ আনন্দ লাভ করে, তারপর তেমনি দুঃখও পায়।

দুনিয়ার জালে আবদ্ধ হয়ে তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَالْمَاشِي فِي الْمَاءِ هَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ أَنْ لَاتَبْتَلَّ قَدَمَاهُ –

অর্থাৎ. দুনিয়াদারের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে পানিতে হাঁটে। পানিতে হাঁটলে পর পদযুগল না ভিজা কি সম্ভবপর?

এই হাদীস থেকে তাদের মূর্খতা জানা গেল, যারা বলে যে, আমাদের দেহ কেবল দুনিয়ার আনন্দের সাথে জড়িত- অন্তর এ থেকে পাক ও পবিত্র। এটা শয়তানের একটা ধোকা মাত্র। কেননা, তাদেরকে যদি দুনিয়ার আনন্দ ও বিলাসিতা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়, তবে তাদের দুঃখ ও বিষাদের অন্ত থাকে না। আন্তরিক সম্পর্ক না থাকলে এই দুঃখ ও কষ্ট কেন হয়?

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ সত্য। পানিতে হাঁটলে যেমন পদযুগল অবশ্যই ভিজে যায়, তেমনি দুনিয়ার সাথে মেলামেশার দ্বারাও অন্তরে এক প্রকার সম্পর্ক ও তামসিক ভাব সৃষ্টি হয়। বরং দুনিয়ার সাথে এই সম্পর্কের কারণে অন্তরে এবাদতের স্বাদ থাকে না। সেমতে হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ আমি সত্য বলছি, রুগ্ন ব্যক্তি যেমন রোগের তীব্রতায় খাদ্যের স্বাদ পায় না, তেমনি যে দুনিয়ার রোগী, সে এবাদতের স্বাদ পায় না।

সারকথা, যে বিষয়ের যতটুকু ভাল থাকা মনে হয়, সেই বিষয় না থাকার কারণে কষ্টও ততটুকুই হয়। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাহ্‌হাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীকে বললেন ঃ তুমি কি তোমার খাদ্য লবণ-মরিচ সহকারে খেয়ে তার উপর পানি ও দুধ পান কর না? যাহ্‌হাক আরয করলেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ এরপর এই খাদ্যের পরিণতি কি হয়, তা তো আপনারই জানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে সে বস্তুর তুল্য বলেন, যা পরিণামে খাদ্য দ্বারা তৈরী হয়ে যায়। হযরত হাসান বলেন ঃ আমি দেখি প্রথমে খাদ্যের মধ্যে খুব মসলা ও সুগন্ধি দেয়া হয়। এরপর একে কোথায় ফেলে আসে! আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

অর্থাৎ, মানুষ লক্ষ্য করে দেখুক তার খাদ্যের প্রতি!

এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে খাদ্য বলে খাদ্যের পরিণতিকে বুঝানো হয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমরকে বলল ঃ আমি আপনাকে একটি

প্রশ্ন করতে চাই; কিন্তু লজ্জা বোধ হয়। তিনি বললেন ঃ লজ্জা করা উচিত নয়। জিজ্ঞেস কর। লোকটি বলল ঃ মানুষ পায়খানা করার পর তার দিকে দেখবে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। ফেরেশতা তাকে বলে ঃ যে বস্তু নিয়ে কৃপণতা করতে তার পরিণাম কি হয়েছে দেখে নে।

হযরত বশীর ইবনে কা'ব বলেন ঃ হে লোকগণ! চল, তোমাদেরকে দুনিয়া দেখিয়ে দিই। এরপর তিনি তাদেরকে কোন পায়খানার স্তূপের কাছে নিয়ে যেতেন এবং বলতেন ঃ এগুলো হচ্ছে, মানুষের ফলমূল, মুরগী, মধু ও ঘি।

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আখেরাতে দুনিয়ার পরিমাণ এমন, যেমন কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল রাখার পর দেখে, আঙ্গুলে কতটুকু পানি এসেছে। অর্থাৎ, আখেরাতের সামনে দুনিয়া তুচ্ছ।

দুনিয়াদার মানুষ দুনিয়ার আনন্দে বিভোর হয়ে আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়। এরপর বড় বড় দুঃখ ও বেদনা সহ্য করে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত তেমনি, যেমন কিছু লোক জাহাজে সওয়ার হয়ে কোন দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছার পর নাবিক তাদেরকে বলল ঃ যার প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন, সে এখানে নেমে প্রয়োজন সেরে আসতে পারে। কিন্তু স্থানটি খুব বিপজ্জনক। যত শীঘ্র সম্ভব কাজ শেষ করে ফিরে আসতে হবে। অন্যথায় জাহাজ ছেড়ে যাবে। সেমতে যাত্রীরা জাহাজ থেকে নেমে পড়ল এবং দ্বীপের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর কেউ কেউ নাবিকদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল; অর্থাৎ, প্রস্রাব-পায়খানা সেরেই কালবিলম্ব না করে জাহাজে ফিরে এল। ফলে, তারা জাহাজে পছন্দসই ও আরামের জায়গা পেয়ে গেল। কতক লোক দ্বীপে বিলম্ব করে তার লতা-পল্লব, ফুলকলি, প্রান্তর, মনমুগ্ধকর সুর লহরী, বিহঙ্গকুলের কলকাকলি, নানা প্রকার মণিমুক্তা, অভাবনীয় চিত্রকলা ও উদ্যানসমূহের মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করল। কিন্তু জাহাজ না পাওয়ার আশংকায় ভ্রমণ শেষ করেই জাহাজে ফিরে এল। তারা যদিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিস্তীর্ণ জায়গা পেল না; কিন্তু সঠিকভাবে বসার মত সুযোগ পেল। তৃতীয় এক দল লোক উল্লিখিত অপরূপ সৌন্দর্যসমূহ অবলোকন করে তাতে নিমগ্ন হয়ে গেল। তারা মূল্যবান মণিমুক্তা, ঝিনুক ও সুমিষ্ট ফলমূল ছেড়ে আসতে চাইল না। ফলে,

সেগুলো যে যতটুকু পারল সঙ্গে নিয়ে নিল। কিন্তু জাহাজে এসে দেখল, বসার মত জায়গা খালি নেই— জিনিসপত্রের বোঝা রাখা তো দূরের কথা। ফলে বাধ্য হয়ে বোঝাগুলো মাথায় বহন করেই জাহাজে বসতে হল। তারা নিজেদের এই কাজের জন্যে অনুতপ্ত ছিল। আরেক দল লোক জঙ্গলে প্রবেশ করে জাহাজের কথা বেমালুম ভুলেই গেল। তারা ভ্রমণে এমনভাবে মেতে রইল যে, নাবিকদের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছল না। এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ছিল হিংস্র জন্তুর ভয়। তারা বুঝত, এই উঁচুনীচু জায়গায় পদস্খলনও হবে, বিপদে পড়তে হবে, পায়ে কাঁটা বিঁধবে, জন্তু-জানোয়ারের ভয়াবহ শব্দে কলিজা কেঁপে উঠবে এবং ঝোপঝাড়ে লেগে কাপড়-চোপড় ছিন্ন হয়ে উলঙ্গ থাকতে হবে। এরপর ফিরে যেতে চাইলেও যাওয়া হবে না। এমনি সময়ে তারা জাহাজের লোকদের আওয়াজ শুনে মাথায় বোঝা বহন করে তীরে পৌঁছল। কিন্তু জাহাজে জায়গা না পেয়ে অবশেষে ক্ষুধা ও পিপাসায় সেখানে মৃত্যুবরণ করল। আরও কিছু লোক জাহাজীদের আওয়াজ শুনল না এবং জাহাজও চলে গেল। ফলে, তাদের কিছু সংখ্যক হিংস্র জন্তুদের খোরাক হয়ে গেল। কিছু সংখ্যক দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে মারা গেল। কিছু সংখ্যক পাঁকে ডুবে মরল।

যাত্রীদের মধ্যে তৃতীয় যে দলটি জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে জাহাজে সওয়ার হতে পেরেছিল, এখন সেগুলোর সংরক্ষণ তাদের কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দিল। কয়েকদিন পরে ফুল শুকিয়ে গেল, পাথর ইত্যাদির রং বদলে গেল, ফলমূল পচে গলে দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। পূর্বে কেবল রাখার সমস্যা ছিল। এখন দুর্গন্ধের কারণে জাহাজে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে গেল। ফলে, অনন্যোপায় হয়ে সকল বোঝা সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হল। কিন্তু এই দুর্গন্ধের প্রভাবে বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং অনেকদিন পর্যন্ত উদরাময়ে ভুগল।

যারা তাদের পূর্বে জাহাজে পৌঁছেছিল, তারা মনমত জায়গা না পেলেও দেশে পৌঁছে কোন অসুখে-বিসুখে পড়েনি। আর যারা সর্বপ্রথম জাহাজে পৌঁছেছিল, তারা জাহাজেও সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করেছে এবং দেশে কোন কষ্টের সম্মুখীন হয়নি।

দুনিয়ার লোকদের অবস্থাও তেমনি। তারা আসল দেশ বিস্মৃত হয়ে দুনিয়ারূপী দ্বীপের পুষ্পোদ্যান, প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যে এমন বিভোর হয়ে

পড়েছে যে, এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করারও অবকাশ নেই। এ বিপদে প্রায় সকলেই পতিত; কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, তার কথা ভিন্ন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর বাণীর প্রতি তাদের বিশ্বাস দুর্বল। এদিক দিয়ে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ আমার, তোমাদের এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন সম্প্রদায়ের লোকজন ধুলায় অন্ধকার জঙ্গলে সফর করে। চলতে চলতে তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখানে এটাও জানা থাকে না যে, যতটুকু পথ অতিক্রান্ত হয়েছে, তা বেশী, না যা বাকী রয়েছে, তা বেশী। এই পর্যায়ে তাদের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা জীবনের আশা ত্যাগ করে জঙ্গলেই পড়ে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে তারা অনেক দূরে একজন সুবেশী ব্যক্তিকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। তার পোশাক থেকে পানি ঝরছিল। মনে হচ্ছিল সে কোন শস্যশ্যামল ভূখণ্ড থেকে আসছে। লোকটি তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলঃ তোমাদের একি অবস্থা? তারা বলল ঃ আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বর্ণনা করার প্রয়োজন কি। লোকটি বলল ঃ আমরা আপনার কথামত কাজ করব। এতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না। লোকটি বলল ঃ আমি যদি তোমাদেরকে পানি ও শস্যক্ষেত্রের ঠিকানা বলে দেই, তবে তোমরা কি করবে? তারা বলল ঃ এতেই কাজ হবে না। পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করতে হবে। সেমতে তারা আল্লাহর কসম খেয়ে অঙ্গীকার করল কোন ব্যাপারেই তারা নাফরমানী করবে না। এমনি কথাবার্তার পর লোকটি উৎকৃষ্ট পানি ও শস্যশ্যামল ভূখণ্ডের ঠিকানা বলে দিল। সে নিজেও কিছুদিন তাদের মধ্যে বসবাস করল। অতঃপর তাদেরকে বলল ঃ ভাইয়েরা আমার, এখানে আর থাকা যাবে না। এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাও। তারা বলল ঃ কোথায় যাব? এর চেয়ে সুন্দর ঝরণা আর উদ্যান অন্যত্র কোথায়? কেউ কেউ যুক্তি পেশ করল ঃ এ জায়গাটি অপ্রত্যাশিত নেয়ামতের মত পেয়েছি। এর চেয়ে সুন্দর জায়গা নিয়ে আমরা কি করব?

অল্প সংখ্যক লোক বলল ঃ ভাই সব, এই লোকের সাথে আমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করেছি যে, তার অবাধ্যতা করব না। সে পূর্বে যা বলেছিল, তা সম্পূর্ণ সত্য হয়েছে। এখনও তার কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সেমতে তারা লোকটির সাথে রওয়ানা হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরা সেখানেই পড়ে রইল। প্রত্যুষে শত্রুপক্ষ এসে আক্রমণ করে তাদের কতককে হত্যা করল এবং কতককে বন্দী করে নিয়ে গেল।

এই হাদীসে 'লোকটি' বলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। তিনি উম্মতকে আখেরাতের দিকে আহ্বান করেন। যে ব্যক্তি আখেরাত দুনিয়া থেকে উত্তম—একথাটি সত্য জেনে তাঁর অনুসরণ করে, সে নিরাপদ থাকে। নতুবা প্রাণের শত্রু শয়তানের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুনিয়াতে মানুষ প্রথম প্রথম খুব মজা লুটে, অবশেষে তার বিরহ জ্বালায় কাতর হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে। এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি নতুন ঘর নির্মাণ করে তাকে খুব সজ্জিত করে। এরপর এক এক সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা সেই ঘরে ভোঁজের নিমন্ত্রণ করে। যখন এক সম্প্রদায় ঘরে আসে, তখন তার সামনে স্বর্ণের একটি আতরদানী পেশ করে, যাতে তার ঘ্রাণ নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের জন্যে রেখে দেয়। কিন্তু এই সম্প্রদায় ভোজসভার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে মনে করে বসে, পাত্রসহ আতর তাদেরকে দেয়া হয়েছে। ফলে, তারা আতরদানীর সাথে অন্তরের খুব সম্পর্ক গড়ে তুলে। কিন্তু গৃহকর্তা যখন আতরদানীটি ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তখন তারা দুঃখিত হয়। অপরপক্ষে যে সম্প্রদায় রীতি-নীতি জানে, সে ঘ্রাণও নেয়, গৃহকর্তার শোকরও করে এবং হৃষ্ট-চিত্তে আতরদানীটি ফিরিয়েও দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার রীতি-নীতি জানে, সে মনে করে দুনিয়া একটি নিয়ন্ত্রণ গৃহ, যার আসবাবপত্র মেহমানদের জন্যে ওয়াকফ। তাই সে দুনিয়ার জিনিসপত্র দ্বারা মুসাফিরের ন্যায় উপকৃত হয় এবং সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পড়ে না। ফলে, মৃত্যুর সময়ও সে বিরহ-জ্বালা ভোগ করে না।

বান্দার জন্যে দুনিয়ার অবস্থা ঃ কেবল দুনিয়ার নিন্দা জেনে নেয়া যথেষ্ট নয়; বরং একথাও জানতে হবে যে, কোন্ দুনিয়া নিন্দার যোগ্য এবং কোন্ দুনিয়া থেকে আত্মরক্ষা করা অপরিহার্য। বলা হয় অন্তরের দু'টি অবস্থার নাম দুনিয়া ও আখেরাত। যে অবস্থাটি অন্তরের নিকটবর্তী; অর্থাৎ

মৃত্যুর পূর্বে, তাকে দুনিয়া বলা হয়। পক্ষান্তরে যে অবস্থাটি এর পরবর্তী; অর্থাৎ মৃত্যুর পরে, তার নাম আখেরাত। এ থেকে বুঝা গেল, যেসব বস্তুর দ্বারা আনন্দ, খাহেশ ও উদ্দেশ্য মৃত্যুর পূর্বে অর্জিত হয়, সেগুলো মানুষের জন্যে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এ থেকে বুঝা উচিত নয় যে, যে বস্তুর প্রতিই ঔৎসুক্য হয়, তাই মন্দ; বরং বস্তুসমূহ তিন প্রকার। প্রথম, সেইসব বিষয়, যা আখেরাতে সঙ্গে থাকে এবং যার ফলাফল মৃত্যুর পর জানা যায়। এরূপ বিষয় দু'টি—একটি এলম ও অপরটি আমল। এলম অর্থ এমন এলম, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম জানা যায় এবং ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, রসূল এবং আকাশ ও পৃথিবীর জ্ঞান অর্জিত হয়। আমল অর্থ আল্লাহ তা'আলার খাঁটি এবাদত। সুতরাং আলেম ব্যক্তি যদিও মাঝে মাঝে এলমের সাথে এমন একাত্ম হয়ে যায় যে, সকল বস্তুর চেয়ে অধিক আনন্দ এলমের মধ্যেই পায়, এমনকি এর খাতিরে যাবতীয় সংসার ধর্মও বর্জন করে, তবু একে নিন্দিত দুনিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয় না; বরং একে আখেরাতের মধ্যেই গণ্য করা উচিত। এমনিভাবে এবাদতকারী ব্যক্তিও তার এবাদতে এমন স্বাদ ও আনন্দ পায় যে, এবাদত না করাকে সে রীতিমত আযাব মনে করতে থাকে। এমনকি জনৈক আবেদ বলেন, মৃত্যুতে আর তো কোন ভয় নেই, ভয় কেবল তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার। অপর একজন আবেদ এই বলে দোয়া করতেন—ইলাহী, কবরে আমাকে নামায, রুকু ও সেজদার শক্তি দান করো। এহেন আনন্দ ও আগ্রহের কারণে এই এবাদতকে দুনিয়া বলা যায়; কিন্তু যে দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, এটা সে দুনিয়া নয়।

অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে—

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلٰوةِ -

অর্থাৎ, দুনিয়ার তিনটি বস্তুকে আমার প্রিয় করা হয়েছে—নারী, সুগন্ধি এবং নামাযে আমার চক্ষুর শীতলতা। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযকেও দুনিয়ার আনন্দসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় দুনিয়ার

বর্ণনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং নিন্দিত দুনিয়ার বর্ণনাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় প্রকার আনন্দের বস্তু সেই সব, যা দ্বারা কেবল জীবদ্দশায়ই উপকার পাওয়া যায় এবং আখেরাতে কোন ফল পাওয়া যায় না। যেমন, পাপকর্মের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বৈধ বস্তু ভোগ করা তথা প্রচুর সোনারুপা, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, গোলাম, বাঁদী, দালান-কোঠা, আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক ও উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করা। এসব বস্তুর আনন্দ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই পাওয়া যায়। তাই এগুলো নিন্দিত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলোর মধ্যে কোনটি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্‌টি অনর্থক—এ বিষয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ রয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু দারদাকে হেমসের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানে দুই দেরহাম ব্যয় করে একটি পায়খানা তৈরী করান। এতেই হযরত উমর তাকে লিখে পাঠান, উমর ইবনে খাত্তাব আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আবু দারদার জানা উচিত যে, পারস্য ও রোমের যে সকল দালান-কোঠা বিদ্যমান ছিল, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ পাক যে দুনিয়াকে বিধ্বস্ত করার আদেশ দিয়েছেন, তুমি তাকে আবাদ করলে কেন? এখন পত্র পাওয়া মাত্রই তুমি পরিবার-পরিজনসহ দামেশকে চলে যাও। এরপর হযরত আবু দারদা সারা জীবন দামেশকেই বসবাস করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ওমর এতটুকু দুনিয়াকেও অনর্থক জ্ঞান করেছেন।

তৃতীয় প্রকার আনন্দের বস্তু হচ্ছে বর্ণিত উভয় প্রকারের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ। উদাহরণতঃ জীবন রক্ষা হয়—এই পরিমাণ খাদ্য, এক জোড়া মোটা বস্ত্র এবং অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য বস্তু; যাতে মানুষ এলম ও আমল অর্জনে সক্ষম হয়। এই প্রকার আনন্দের বস্তু দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না; বরং আখেরাতের কাজে সহায়ক হয় বিধায় এগুলো প্রথম প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এগুলোকে সহায়তা লাভের নিয়তে সংগ্রহ করবে, তাকে দুনিয়াদার বলা হবে না। আর যদি কেবল পার্থিব আনন্দ লাভের উদ্দেশে সংগ্রহ করে, তবে দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দুনিয়ার বস্তুরূপে গণ্য হবে।

মৃত্যুর পর মানুষের সাথে তিনটি বিষয় থাকে— (১) দুনিয়ার

মলিনতা থেকে অন্তরের পবিত্রতা, (২) আল্লাহর যিকরের প্রতি আসক্তি এবং (৩) আল্লাহর মহব্বত। অন্তরের পবিত্রতা দুনিয়ার খাহেশ বর্জন ব্যতীত অর্জিত হয় না। যিকরের আসক্তি অধিক ও সার্বক্ষণিক যিকর ছাড়া সহজসাধ্য হয় না। আল্লাহর মহব্বত মারেফত ছাড়া হাসিল হয় না। এ তিনটি বিষয় অর্থাৎ, পবিত্রতা, আসক্তি এবং মহব্বত মৃত্যুর পরই সৌভাগ্য ও মুক্তির কারণ হয়। দুনিয়া খাহেশ থেকে অন্তরের পবিত্রতা এজন্যে মুক্তির কারণ হয় যে, এটা আযাব ও মানুষের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, মানুষের আমল তার পক্ষ থেকে লড়বে। উদাহরণতঃ আযাব যখন পায়ের দিক থেকে আসবে, তখন তাহাজ্জুদ তাকে রুখে দাঁড়াবে। যখন হাতের দিক থেকে আসবে, তখন যাকাত তাকে বাধা দেবে। মহব্বত এ কারণে মুক্তিদাতা যে, এর কারণে খোদায়ী দীদারের গৌরব নসীব হয়। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষ এই গৌরবের অংশপ্রাপ্ত হয় এবং জান্নাতে দীদারের সময় পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকে। ফলে, মৃত্যুর পরই কবর সুখ ও শান্তির আবাসস্থল হয়ে যায়। কেন হবে না, আশেকের প্রিয়জন তো একজনই, যার মিলনে পার্থিব সম্পর্ক অন্তরায় ছিল। মৃত্যুর কারণে যখন সে অন্তরায় দূর হয়ে গেল, তখন প্রিয়জন ও প্রার্থিত দীদারের আর কি বাধা রইল? দুনিয়াদার ব্যক্তির কবরে আযাব হয়। কেননা, তার প্রেমাস্পদ কেবল দুনিয়া ছিল, যা মৃত্যুর কারণে হস্তচ্যুত হয়ে গেল এবং তাতে ফিরে আসার কোন পথই আর রইল না। যখন প্রেমাস্পদই নেই, তখন দুঃখ ও আযাব হবে না তো কি হবে!

এ থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি দুনিয়ার খাহেশ দমন করার জন্যে নিরন্তর যিকর, চিন্তাভাবনা ও আমল করতে থাকে, সে আখেরাতের পথিক। সুস্বাস্থ্য ছাড়া এসব বিষয় সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য, খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান ছাড়া সম্ভব নয়। এদের প্রত্যেকটির জন্যে পৃথক সাজসরঞ্জাম দরকার। অতএব, যে ব্যক্তি খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান আখেরাতের প্রয়োজন পরিমাণে হাসিল করে, সে দুনিয়াদার নয়। বরং দুনিয়া হবে তার জন্যে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। পক্ষান্তরে যে এসব বস্তু কেবল মানসিক আনন্দ ও বিলাসিতার জন্যে হাসিল করে, সে দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য হবে।

কিন্তু পার্থিব আনন্দের আগ্রহও দু'প্রকার। এক, যাতে আগ্রহী ব্যক্তি

আখেরাতে আযাবের যোগ্য হয়। একে বলা হয় হারাম। দুই, যাতে আগ্রহী ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না এবং হিসাব-নিকাশ দীর্ঘ হয়। এর নাম হালাল। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে একথা স্পষ্ট যে, কিয়ামতের ময়দানে হিসাবের অপেক্ষায় থাকাও একটি আযাব। সেমতে হাদীসে আছে—

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَّحَرَامُهَا عَذَابٌ

অর্থাৎ, দুনিয়ার হালাল হল হিসাব এবং হারাম হল আযাব।

আরও বলা হয়েছে—

حَلَالُهَا عَذَابٌ اِلَّا اَنَّهُ اَخَفُّ مِنْ عَذَابِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ, দুনিয়ার হালালও আযাব। তবে এটা হারামের আযাবের চেয়ে হালকা।

যদি হিসাব না-ও হয়, তবে উচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকা এবং মনে সে বাসনা উদয় হওয়াও আযাবের চেয়ে কম নয়। এর নযীর দুনিয়াতেই দেখা যায়, কোন সমকক্ষ ব্যক্তি পার্থিব সৌভাগ্যে অগ্রগামী হয়ে গেলে অন্তরে কেমন পরিতাপের জ্বালা অনুভূত হয়! অথচ এই পার্থিব মর্যাদা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। সুতরাং পার্থিব আনন্দেই যখন এই জ্বালা, তখন আখেরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে সে জ্বালা আরও তীব্র হবে।

অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগ করে, তা কোন প্রাণীর সুললিত কণ্ঠস্বর থেকে হলেও তার আনন্দের অংশ আখেরাতে হ্রাস পাবে। অনুরূপভাবে যদি কোন পুষ্পোদ্যান দেখে অথবা ঠাণ্ডা পানি পান করে কেউ আনন্দ লাভ করে, তাহলে কিয়ামতে তার বিনিময়ে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ আনন্দ হ্রাস পাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত এরশাদের উদ্দেশ্য তাই। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ

هٰذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِىْ يُسْئَلُ عَنْهُ

অর্থাৎ, এটাও সে নেয়ামত, যে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

এখানে ঠাণ্ডা পানির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ কারণেই যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর পানির পিপাসা হলে

লোকেরা মধুমিশ্রিত পানি উপস্থিত করে, তখন তিনি পানি হাতে ঘুরাতে-ফিরাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত পান না করে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

عَنِّى حِسَابَهَا اَعْزِلُوْا -

অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে এর হিসাব সরিয়ে নাও।

সারকথা, দুনিয়া অল্প হোক কি বেশী হোক— হারাম হোক কি হালাল— সবই দূষিত কিন্তু যে পরিমাণ দুনিয়া খোদা-ভীতির সহায়ক, সে পরিমাণ ভাল। বরং এ পরিমাণটি দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। যার আল্লাহর মারেফত অধিকতর শক্তিশালী হবে, সে দুনিয়ার আনন্দ থেকে অধিকতর বেঁচে থাকবে। হযরত ঈসা (আঃ) একবার শোয়ার সময় পাথরের উপর মাথা রেখেছিলেন। কিন্তু ইবলীস মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এসে আরয করল ঃ আপনিও কি দুনিয়ার প্রতি উৎসুক? তিনি তৎক্ষণাৎ পাথরটি মাথার নীচ থেকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করলেন।

একারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সাঃ) থেকে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি উপর্যুপরি কয়েকদিন খাবার গ্রহণ করতেন না। ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। ওলীগণের অবস্থাও তেমনি হয়ে থাকে। এর কারণে আখেরাতে তাদেরকে পূর্ণ অংশ দান করা হবে। স্নেহশীল পিতা তার পুত্রকে ফলমূল ইত্যাদি থেকে ফিরিয়ে রাখে; কিন্তু ইনজেকশন ও অপারেশন করে ব্যথা দেয়। এ কাজ কৃপণতা ও নিষ্ঠুরতার কারণে করা হয় না; বরং এর কারণ স্নেহ ও মহব্বত।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে বস্তু বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে নয়, তাই হল দুনিয়া। আর যে বস্তু বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে, তা দুনিয়া নয়। কোন্ বস্তুটি বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে—এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা হবে— বস্তু তিন প্রকার। প্রথম, এমন বস্তু, যা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না। যেমন, গোনাহের কাজকর্ম ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং সে সমস্ত বৈধ নেয়ামত, যেগুলো নিছক দৈহিক আরাম ও সুখের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বস্তুই

বিশেষভাবে দুনিয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দনীয়। দ্বিতীয় এমন বস্তু, যা দৃশ্যত আল্লাহর জন্যে; কিন্তু গায়রুল্লাহর জন্যেও হতে পারে। এরূপ বস্তু তিনটি—চিন্তাভাবনা, যিকর ও খাহেশ থেকে বিরত থাকা। এই তিনটি কাজ যদি গোপন করা হয় এবং এর পেছনে আল্লাহর খাহেশ ও আখেরাতে ভয় ছাড়া অন্য কোন কারণ না থাকে, তবে এগুলো আল্লাহর জন্যে হবে এবং দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। কিন্তু পার্থিব স্বার্থে এগুলো করা হলে দুনিয়ার মধ্যেই গণ্য হবে। যেমন, কেউ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ও বিশিষ্ট হওয়ার উদ্দেশে ফিকরের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে, মানুষের মধ্যে সাধক বলে খ্যাত হওয়ার জন্যে যিকর করে এবং ধনসম্পদ বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অথবা স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্যে খাহেশ বর্জন করে।

তৃতীয় এমন বস্তু, যা বাহ্যত মানসিক আনন্দ লাভের জন্যে; কিন্তু মর্মগতভাবে আল্লাহর জন্যেও করা যায়; যেমন খাদ্য, বিবাহ ইত্যাদি। এগুলোতে নিয়ত কেবল মানসিক আনন্দ হলে এগুলো দুনিয়া। আর যদি এবাদতে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে আল্লাহর জন্যে হবে। হাদীসে আছে—

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَمَنْ طَلَبَهَا اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَصِيَانَةً لِّنَفْسِهٖ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হালাল পন্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ও গর্ব করার জন্যে দুনিয়া অন্বেষণ করে, সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দারিদ্র্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং নিজেকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে দুনিয়া অর্জন করে, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উঠবে যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে। দেখ, শুধু নিয়ত বদলে যাওয়ার কারণে অবস্থা কেমন বদলে যায়। এ থেকে জানা গেল, সেই আনন্দকেই দুনিয়া বলে, যা জীবদ্দশায় শেষ হয়ে যায় এবং আখেরাতে কোন কাজে আসে না। একেই "হাওয়ায়ে নফস" তথা রৈপিক কামনা বলা হয়। নিম্নের

আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

অর্থাৎ, এবং যে নফসকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টির নাম দুনিয়া বলা হয়েছে—

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ -

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন হচ্ছে খেলাধুলা, ক্রীড়াকৌতুক, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক গর্বাহংকার এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা।

এই পাঁচটি বিষয় থেকে সাতটি ফলাফল অর্জিত হয়, যা নিম্ন আয়াতে একত্রে বর্ণিত হয়েছে—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু।

অতএব, যে বস্তু আল্লাহ তা'আলার জন্যে, তা দুনিয়া নয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থান যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পরিমাণ হয়, তবে তা আল্লাহর জন্যে। আর এসব বস্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত আকর্ষণ করা বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহর জন্যে নয়। এ দু'টি স্তরের মাঝখানে

আরও একটি স্তর আছে, যাকে অভাব বলা হয়। এই অভাবেরও দু'টি প্রান্ত ও একটি মধ্যভাগ আছে। এক প্রান্ত প্রয়োজনের সীমার কাছাকাছি। এটা কিছুতেই ক্ষতিকর নয়। কেননা, মানবীয় প্রয়োজনাদি সত্ত্বেও কেবল প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ থাকা মানুষের জন্যে অসম্ভব। অভাবের অপর প্রান্ত বিলাসিতার সীমার কাছাকাছি। এ প্রান্ত থেকে নিজেকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখাই উত্তম। কেননা, যে ব্যক্তি রাজকীয় চারণভূমির কাছে কাছে জন্তু নিয়ে ঘুরাফেরা করে, তার জন্যে চারণভূমিতে ঢুকে পড়া আশ্চর্য নয়। প্রয়োজনের কাছাকাছি যে প্রান্তটি রয়েছে, যথাসম্ভব তার কাছেই থাকবে। কেননা, এসব বিষয়ে পয়গম্বর ও ওলীগণের অনুসরণ করাই শ্রেয়। তাঁদের সবাই সদাসর্বদা নিজেদেরকে প্রয়োজনের সীমার কাছাকাছি রাখতেন।

সেমতে হযরত ওয়ায়স কারনী নিজেকে প্রয়োজনের সীমার এত কাছাকাছি রাখতেন যে, পরিবারের সবাই তাকে পাগল মনে করত। তারা তাঁর বসবাসের জন্যে বাড়ীর দরজায় একটি কক্ষ তৈরী করে দিয়েছিল। তিনি তাতেই থাকতেন। কখনও এক বছর, কখনও দু'বছর এবং কখনও তিন বছর পর বাড়ী আসতেন। এতদিন পর্যন্ত কেউ তার মুখ দেখতে পেত না। এশার শেষ সময়ের পরে কক্ষে আসতেন এবং ফজরের আযানের পূর্বে বের হয়ে যেতেন। আহার এই স্থির করেছিলেন যে, সারা দিন খোরমার বীচি কুড়াতেন। কোন শুষ্ক বড় খোরমা তাতে পাওয়া গেলে সেটি ইফতারের জন্যে রেখে দিতেন। বেশী পাওয়া গেলে নিজের প্রাণরক্ষার জন্যে যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু রেখে ফকীরদেরকে সদকা করে দিতেন। কোন বড় খোরমা না পেলে বীচি বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে কোন খাবার কিনে খেয়ে নিতেন। তাঁর বস্ত্রের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা ছেঁড়াবাস কুড়িয়ে এনে ফোরাতের পানিতে ধুতেন। অতঃপর সেগুলোকে একত্রে সেলাই করে পরতেন। অধিকাংশ শিশু তাকে পাগল মনে করে নুড়ি নিক্ষেপ করত। তখন তিনি তাদেরকে বলতেন ঃ ভাইয়েরা আমার, যদি আমাকে ঢিল মার, তবে ছোট ছোট ঢিল মারবে। বড় ঢিল মারলে যদি রক্ত বের হয়ে যায়, তবে পানি না পাওয়া গেলে নামাযে ব্যাঘাত হতে পারে। এগুলো ছিল হযরত ওয়ায়স কারনীর স্বভাব-চরিত্র। এ কারণেই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) নিজের কালামে তাঁকে একজন মহান

ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করেই এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি করুণাময়ের সুগন্ধি এয়ামনের দিক থেকে পাই।

হযরত উমর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন সবাইকে সমবেত করে বললেন, তোমরা সবাই কুফায় বসে যাও। সবাই বসে গেল। এরপর খলীফা বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ইরাকের অধিবাসী, সে দাঁড়াও। এরপর বললেন ঃ তোমরাও বসে যাও। তবে মুদার গোত্রের কেউ থাকলে দাঁড়াও। অতঃপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি কারনের অধিবাসী, সে ছাড়া সকলেই বসে যাক। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রইল। খলীফা তাকে বললেন ঃ তুমি কি কারনের অধিবাসী? সে বলল ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি ওয়ায়স ইবনে আমের কারনীকে চিন? এরপর তিনি তার যাবতীয় অবস্থা বর্ণনা করলেন। লোকটি বলল ঃ জী হাঁ চিনি হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আল্লাহর কসম, আমাদের গোত্রে ওয়ায়স সর্বাধিক নির্বোধ ও পাগল ব্যক্তি। একথা শুনে খলীফা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি যা কিছু বলেছি, নিজে থেকে বলিনি; বরং এসব কথা আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছি। তিনি আরও বলেছেন,

يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

অর্থাৎ, তাঁর শাফায়েতের মধ্যে রবীয়া ও মুযার গোত্রের সমপরিমাণ লোক অন্তর্ভুক্ত হবে।

হারম ইবনে হাব্বান (রাঃ) বলেন ঃ হযরত উমরের মুখে এসব কথা শুনে আমি কুফায় গেলাম। ওয়ায়সের সন্ধান লাভ করা ছাড়া এ সফরের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য ছিল তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা। সেমতে আমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি তখন ফোরাতের তীরে বসে দুপুরের সময় উযু করছিলেন। হারম ইবনে হাব্বান বলেন ঃ আমি শুনে আসা চিহ্নসমূহের মাধ্যমে চিনে নিলাম যে, ইনিই ওয়ায়স কারনী। গৌর বর্ণের এই লোকটি অত্যন্ত শক্ত দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ মুণ্ডিত এবং দাড়ি অত্যন্ত ঘন ছিল। দেখতে বিশ্রী ছিলেন।

আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি করমর্দন করতে অস্বীকার করলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত হোক আপনার প্রতি। আপনার কি অবস্থা হে ওয়ায়স কারনী। একথা শুনে তার দু'চোখ মহব্বতের অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। তখন তার যে অদ্ভুত অবস্থা দেখা গেল, তার কিছুটা আমি জানি। অবশেষে আমিও কাঁদলাম, তিনিও কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ হে হারম ইবনে হাব্বান, আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন—এখানে কেমন করে এলে? তোমার অবস্থা কি? আমার ঠিকানা কোথায় পেলে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার কাছে আসার পথপ্রদর্শন করেছেন।

ইবনে হাব্বান বলেন ঃ আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না যে, তিনি আমাকে কেমন করে চিনতে পারলেন! অথচ আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে না আমি কখনও তাঁকে দেখেছিলাম, না তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি আমাকে কেমন করে চিনলেন এবং আমার পিতার নাম কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন ঃ

نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন।

তুমি জান না, আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকে। আমার আত্মা তোমার আত্মাকে চিনে নিয়েছে। মুমিনগণ একে অপরকে চিনে। তারা পরস্পরের বন্ধু। আত্মাদের পারস্পরিক কথাবার্তা হয়; যদিও তাদের বাসস্থান দূরে দূরে থাকে এবং মাঝখানে বহু মনযিলের দূরত্ব থাকে। আমি বললাম ঃ কোন একটি হাদীস বর্ণনা করুন। আমি আপনার মুখ থেকে একটি হাদীস শুনতে আগ্রহী। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে দেখিনি এবং কখনও তাঁর পবিত্র খেদমতে হাযির হতে পারিনি। তবে আমি তাঁদেরকে দেখেছি, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সংসর্গ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মুখ থেকে আমি হাদীস শুনেছি, যেমন তুমি শুনেছ। আমি নিজের উপর এর দরজা উন্মুক্ত করা ভাল মনে করি না। আমি মুহাদ্দিস, মুফতী অথবা কাযী হতে চাই না। ইবনে হাব্বান! আমি আত্মসংশোধনে এত অধিক ব্যস্ত যে, এসব বিষয়ে মানুষের সাথে ব্যাপৃত

থাকার ফুরসত নেই। অতঃপর আমি বললাম ঃ তা হলে কোরআন পাকের কোন আয়াতই পাঠ করুন আমি শুনি। আমার জন্যে দোয়া করুন এবং আমাকে উপদেশ দিন, যা আমি স্মরণ রাখব। আপনার সাথে আমার নিছক মহব্বত আল্লাহর ওয়াস্তে। ইবনে হাব্বান বলেন ঃ এরপর তিনি উঠলেন এবং আমার হাত ধরে ফোরাতের কিনারায় পায়চারি করতে লাগলেন। এসময় বললেন ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অতঃপর কাঁদলেন এবং আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ, আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এতদুভয়কে সৎ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

এ আয়াতটি তিনি اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ পর্যন্ত পাঠ করে এত জোরে চীৎকার করে উঠলেন যে, আমার মনে হল তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ হে ইবনে হাব্বান, তোমার পিতা মারা গেছেন। অতি সত্বর তুমিও মরবে। অতঃপর জান্নাতে অথবা দোযখে যাবে। শুরু থেকে দেখ, আদম ও হাওয়ার ওফাত হয়েছে। এরপর নূহ (আঃ)-এর মিলন হয়েছে। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর ইন্তেকাল হয়েছে। মূসা (আঃ) বিদায় নিয়েছেন এবং দাউদ (আঃ) পরলোকগমন করেছেন। এরপর আসমান ও যমীন সৃষ্টির মূল কারণ, রাব্বুল আলামীনের প্রিয়জন, শাফিউল মুযনিবীন মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঊর্ধ্ব জগতের অধিপতি হয়েছেন। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) উপরের ফেরদাউসে আস্তানা গেড়েছেন। এরপর আমার ভাই ও বন্ধু হযরত উমর

(রাঃ)-ও তাঁর পশ্চাদগমন করেছেন। একথা বলে তিনি 'হায় উমর', 'হায় উমর' বলে কাঁদতে লাগলেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! হযরত উমর তো এখনও জীবিত আছেন—মারা যাননি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওফাতের সংবাদ আমাকে দিয়েছেন এবং আমার ওফাতের খবরও দিয়েছেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি ও তুমিও যেন মৃতদের মধ্যেই রয়েছি। এরপর হযরতের বিদেহী আত্মার প্রতি দুরূদ পাঠ করে নীরবে অনেক দোয়া করলেন।

এরপর হযরত ওয়ায়স কারনী বললেন ঃ ইবনে হাব্বান! আমার উপদেশ এই যে, আল্লাহর কিতাব ও সৎকর্মপরায়ণদের পদ্ধতিকে নিজের কর্মপদ্ধতি রাখবে। আমার ও তোমার মৃত্যুর খবর আমি পেয়ে গেছি, মৃত্যুকে সদা-সর্বদা স্মরণ রাখবে এবং এক মুহূর্তও গাফেল হবে না। যখন নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করবে, উপদেশ দেবে এবং সমস্ত উম্মতের শুভ কামনা করবে। যদি দল থেকে অর্ধ হাত পরিমাণে আলাদা হয়ে যাও, তবে ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে যাবে অথচ টেরও পাবে না। পরিণামে দোযখে পতিত হবে। নিজের জন্যে এবং আমার জন্যে দোয়া করবে। এরপর তিনি বললেন ঃ ইলাহী, এ ব্যক্তি নিজ জানা মতে আমাকে তোমার জন্যে ভালবাসে এবং তোমার জন্যেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। জান্নাতেও তার মুখমণ্ডল আমাকে দেখাবে এবং দারুস-সালামে তাকে আমার কাছে পাঠাবে। সে যতদিন জীবিত থাকে, তার প্রাণ ও ধন-সম্পদের দেখাশুনা করো এবং সামান্য দুনিয়া নিয়ে কৃতজ্ঞ হওয়ার তৌফিক তাকে দান করো। আমার পক্ষ থেকেও তাকে প্রতিদান দিও। এরপর বললেন ঃ হে হারম ইবনে হাব্বান, এখন তোমাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি, আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপর আর কখনও আমার কাছে আসবে না। আমি খ্যাতি অপছন্দ করি। নির্জনতা আমার ভাল লাগে। আমি অন্তর দ্বারা তোমার কাছে আছি যদিও দেখতে দূরে। অতএব তালাশ করার প্রয়োজন নেই। আমাকে স্মরণ করে আমার জন্যে দোয়া করবে। আমিও ইনশাআল্লাহ্ তাই করব। এখন আমি এদিকে যাচ্ছি। তুমি ওদিকে যাও। আমি কিছুদূর তার

সাথে চলতে চাইলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না এবং আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং আমাকেও কাঁদালেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমি তাঁর অবস্থা কতভাবে জানতে চেয়েছি; কিন্তু কেউ বলতে পারেনি। আল্লাহ তাঁর মাগফেরাত করুন। এ ছিল আখেরাতের লোকদের অবস্থা।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল, আকাশের নিচে ও যমীনের উপরে যা কিছু রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যেসব বস্তু আল্লাহর জন্যে, সেগুলো ছাড়া বাকী সবই দুনিয়া। দুনিয়া আখেরাতের বিপরীত। যে বস্তু দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্য তাই আখেরাত। সুতরাং দুনিয়ার যেটুকু দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের শক্তি অর্জিত হয়, সে পরিমাণ দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। এ বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো যাক। উদাহরণতঃ কোন হাজী হজ্জের পথে কসম খেল যে, সে হজ্জ ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হবে না। এরপর সে হজ্জের পথে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের হেফাযত করল, সওয়ারীকে ঘাস-পানি খাওয়াল অথবা আসবাবপত্রের থলে সেলাই করল। এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। তাকে হজ্জের মধ্যেই মশগুল বলে গণ্য করা হবে। অনুরূপভাবে মানুষের দেহও আত্মার সওয়ারী, যা দ্বারা সে জীবনের দূরত্ব অতিক্রম করে। সুতরাং এলম ও আমলের শক্তি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে দেহের যত্ন নেয়া দুনিয়ার মধ্যে নয়; বরং আখেরাতের মধ্যে গণ্য হবে। অবশ্য যদি যত্ন নেয়া দেহের আনন্দ ও বিলাসের জন্যে হয়, তবে তা হবে বৈরী কাজ। এতে অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। তানানেসী (রহঃ) বলেন ঃ আমি কা'বা মসজিদের বনী শায়বা দরজায় সাতদিন পর্যন্ত উপবাস করলাম। অষ্টম রাত্রিতে আমি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম—যে কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত দুনিয়া গ্রহণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তশ্চক্ষুকে অন্ধ করে দেবেন। "মানুষের জন্যে দুনিয়ার অবস্থা" শীর্ষক এই বর্ণনা সম্পর্কে খুব চিন্তা কর। ইনশাআল্লাহ হেদায়াত পাবে।

যে সব কারণে মানুষ নিজেকে ও স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়েছে ঃ প্রকাশ থাকে যে, বাইরে বিদ্যমান বস্তুসমূহকে সাধারণত দুনিয়া বলে ব্যক্ত করা

হয়। এগুলো হচ্ছে পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরিস্থিত বস্তুসমূহ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, পৃথিবীর সবকিছুকে আমি পৃথিবীর সাজসজ্জা করেছি; যাতে মানুষকে পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কার আমল উত্তম।

পৃথিবী তো মানুষের শয্যা, বাসস্থান ও অবস্থানস্থল। তার উপরিস্থিত বস্তুসমূহ পানাহার, বস্ত্র ও সংসর্গে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র ভূপৃষ্ঠের বস্তুসমূহ তিন প্রকার—খনিজ, উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজ। উদ্ভিদ খাদ্য ও ঔষধের জন্যে কাম্য। খনিজ পদার্থ যন্ত্রপাতি ও পাত্র নির্মাণে ব্যবহৃত। প্রাণীজ দু'প্রকার—মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু। চতুষ্পদ জন্তুকে মাংস, বোঝা বহন ও সাজসজ্জার জন্যে রাখা হয়। মানুষ দ্বারা কখনও সেবা নেয়া উদ্দেশ্য হয়। যেমন, গোলাম ও বাঁদী দ্বারা নেয়া হয়। কখনও সঙ্গম উদ্দেশ্য হয়; যেমন নারীদের মধ্যে স্ত্রী ও বাঁদীদের সাথে করা হয়। আবার কখনও সম্মান ও তাযীম পাওয়ার জন্যে অন্তরসমূহকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা লক্ষ্য হয়। একে বলা হয় "জাহ" তথা মানুষের মনের মালিক হওয়া।

অতএব, এ সকল বস্তুকে বলা হয় দুনিয়া। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে এগুলোকে একত্রে উল্লেখ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ -

অর্থাৎ সুসজ্জিত করা হয়েছে মানুষের জন্যে নারী ও সন্তান-সন্ততির মোহ।

এগুলো মানুষ সম্পর্কিত।

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

অর্থাৎ, সঞ্চিত স্বর্ণরৌপ্যের মোহ।

এগুলো খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত। এতে মোতি, এয়াকূত ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ

অর্থাৎ, চিহ্নিত অশ্ব ও গবাদি পশুর মোহ।

এগুলো প্রাণীজ সম্পর্কিত। وَالْحَرْثِ এবং ক্ষেত্র-খামারের মোহ।

এগুলো উদ্ভিদ সম্পর্কিত।

কিন্তু মানুষের সাথে ভূ-পৃষ্ঠের এসকল বস্তুর সম্পর্ক দু'টি। একটি তার অন্তরের সাথে এবং অপরটি দেহের সাথে। অন্তরের সাথে সম্পর্ক হল, মানুষের অন্তরে এসব বস্তুর মহব্বত। ফলে সে এগুলোর হেফাযত করে এবং এগুলোর প্রতি সর্বশক্তি নিয়োজিত করে; যেন সে দুনিয়ার দাস। এ সম্পর্কের মধ্যে দুনিয়ার সাথে জড়িত অন্তরের সকল গুণাগুণ অন্তর্ভুক্ত। যেমন, অহংকার, দ্বেষ, হিংসা, রিয়া, সুখ্যাতি, কুধারণা, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি। এ সম্পর্ককে বাতেনী দুনিয়া বলা হয়। আর যাহেরী দুনিয়া হচ্ছে উল্লিখিত বস্তুসমূহ। দেহের সাথে সম্পর্ক হল দেহ এসব বস্তুকে ঠিকঠাক রাখার কাজে দেহের নিয়োজিত হওয়া, যাতে এগুলো নিজের এবং অপরের আনন্দ লাভের যোগ্য হয়ে যায়। এ সম্পর্কের মধ্যে যাবতীয় পেশা ও কারিগরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে মানুষ দিবারাত্র মশগুল ও নিমজ্জিত।

উপরোক্ত দু'টি সম্পর্কের কারণে মানুষ না নিজের খবর রাখে, না দুনিয়াতে তার পরিণাম ও সূচনা সম্পর্কে কোন চিন্তা করে। যদি সে নিজেকে এবং নিজের পালনকর্তাকে চিনত এবং দুনিয়ার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করত, তবে নিশ্চিতরূপেই জানতে পারত যে, দুনিয়ার বস্তুসমূহ অর্থাৎ, যাহেরী বা বাহ্যিক দুনিয়া সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, যে সওয়ারীতে বসে আল্লাহ তা'আলার কাছে যেতে হবে, তার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করা। এখানে সওয়ারী অর্থ মানবদেহ। পানাহার, বাসস্থান ও বস্ত্র ব্যতীত এ দেহ টিকে থাকতে পারে না। হজ্জের পথে উট যদি দানাপানি ও বিশ্রাম না পায়, তবে সে জীবিত থাকতে পারে না। যে মানুষ দুনিয়াতে নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, সে সেই হজ্জযাত্রীর মত, যে মনযিলে অবস্থান করে কেবল উটের ঘাস-পানি, সাজসজ্জা ও খেদমতের কাজে মশগুল থাকে। কোন জায়গা থেকে ঘাস আনে আর কোন জায়গা থেকে ঠাণ্ডা পানি সংগ্রহ করে। এমনি চিন্তায় ব্যাপৃত থাকার কারণে সে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সে জানেও না যে, এরূপ করলে হজ্জ তো যাবেই, তৎসঙ্গে উটসহ সে নিজেও কীটপতঙ্গ ও পোকা-মাকড়ের খোরাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিচক্ষণ হাজীর অন্তর কা'বাগৃহ ও হজ্জের মধ্যে ব্যাপৃত থাকবে এবং সওয়ারীর সেবাযত্ন প্রয়োজন পরিমাণে করবে, যাতে তার চলার ক্ষমতা বহাল থাকে।

অনুরূপভাবে আখেরাতের সফরে যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, সে দেহের জরুরী খেদমত কর; যেমন কেউ প্রয়োজনের সময় পায়খানায় যেয়ে বসে। আহার্য গ্রহণ করা এবং তাকে মলদ্বার দিয়ে বের করায় কোন তফাৎ নেই। উভয় কাজ প্রয়োজনের জন্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং পায়খানার কাজে যেমন মানুষ প্রয়োজন পরিমাণেই ব্যাপৃত হয়, তেমনি উদরপূর্তির কাজেও প্রয়োজন অনুযায়ী মশগুল থাকা দরকার। যে বস্তুটি মানুষকে আল্লাহর দিক থেকে অধিকতর ফিরিয়ে রাখে, সেটি হচ্ছে উদর। এর কারণেই মানুষ দুনিয়া ও তার রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার ফলেই সীমাহীন কর্মব্যস্ততা প্রয়োজন এবং এসব কর্মব্যস্ততায় পেরেশান হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য ভুলে যায়।

আমরা এখানে দুনিয়ার কাজকর্মের বিবরণ এবং তৎপ্রতি মানুষের প্রয়োজন বিশদভাবে বর্ণনা করব, যাতে জানা যায় যে, দুনিয়ার কাজকর্মের কারণে মানুষ আল্লাহর দিক থেকে কিভাবে গাফেল হয়ে যায় এবং নিজের পরিণতি কিভাবে বিস্মৃত হয়ে থাকে?

দুনিয়ার মানুষ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত রয়েছে। এসব বৃত্তির প্রাচুর্যের কারণ এই যে, মানুষ তিনটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী—অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। অন্ন জীবন ধারণের জন্যে, বস্ত্র শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং বাসস্থান উত্তাপ ও শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং পরিবার-পরিজন ও জান-মালের হেফাযতের জন্যেও প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আ্লা মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান এরূপ করে সৃষ্টি করেননি যে, তাতে মানুষের কর্ম ও নৈপুণ্যের কোন দখল থাকবে না। অবশ্য চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের জন্যে এরূপ করেছেন। উদাহরণতঃ পশুখাদ্য ঘাস রান্না করে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে পশুদের

দেহের লোম পোশাকসদৃশ হওয়ার কারণে তাদের আলাদা পোশাকের প্রয়োজন নেই। তাদের মাংসই এমনভাবে গঠিত যাতে উত্তাপ ও শৈত্য প্রভাব বিস্তার করে না। তারা বনে জঙ্গলে থাকতে পারে। তাই বাসস্থানেরও প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এজন্যে প্রাথমিক স্তরে এবং মূলত পাঁচটি শিল্পকর্মের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কৃষি, পশুচারণ, শিকার, বুনন ও নির্মাণ। অতএব, কৃষক শস্য উৎপাদন করে। রাখাল গবাদি পশুর দেখাশুনা করে এগুলো থেকে বাচ্চা গ্রহণ করে। শিকারী এমন বস্তু সংগ্রহ করে, যার সৃষ্টিতে মানবকর্মের কোন দখল নেই— আপনা থেকে উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করার জন্যে অনেক কারিগরি বিদ্যার প্রয়োজন হয়। অতঃপর প্রত্যেক বিদ্যার জন্যে যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার দরকার হয়, যেমন, কৃষি যন্ত্রপাতি, বুনন যন্ত্রপাতি এবং গৃহ নির্মাণ যন্ত্রপাতি। শিকারের যন্ত্রপাতি কাষ্ঠ নির্মিত, লৌহনির্মিত, অথবা জন্তু-জানোয়ারের চর্মনির্মিত হয়ে থাকে। এতে আরও তিন প্রকার কারিগর প্রয়োজন হয়— কাঠমিস্ত্রী, কামার ও চামড়া শিল্পী। কাঠমিস্ত্রী সেই, যে আমাদের উদ্দেশ্যে কাঠের কাজ করে। কামার সেই ব্যক্তি, যে খনিজ পদার্থের কাজ করে— লোহার কাজ করুক অথবা স্বর্ণের। চামড়া শিল্পীও সেই ব্যক্তি, যে চামড়ার ও জন্তু-জানোয়ারের অঙ্গ ও অংশের কাজ করে। সুতরাং এগুলো হচ্ছে মৌলিক কারিগরি।

এরপর মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে একা থাকতে পারে না। সমাজবদ্ধতার মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, তার মত অন্য মানুষ তার কাছে থাকতে হবে। দু'কারণে সমাজবদ্ধতার প্রয়োজন। প্রথমত, মানবজাতির অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্যে। নারী ও পুরুষের একত্রে থাকা ছাড়া এটা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, একে অপরকে খাদ্য ও পোশাক তৈরীতে এবং সন্তান-সন্ততির লালন-পালনে সাহায্য করার জন্যে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একাকী কৃষি কাজ করতে পারে না। কারণ, কৃষিকাজের জন্যে যন্ত্রপাতি দরকার। যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্যে কাঠমিস্ত্রী, কামার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক। খাদ্যের জন্যে আটা পিষ্টকারী, রন্ধনকারী আবশ্যক। সারকথা, মানুষের একাকী বসবাস করা কঠিন।

সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার জন্যে সুদৃঢ় গৃহ নির্মাণ করে এক একটি পরিবার তাদের সাজ-সরঞ্জামসহ আলাদা আলাদা থাকা জরুরী, যাতে বাহ্যিক যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয় এবং চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকেও হেফাযতে থাকা যায়। এসব কারণেই শহর ও নগরসমূহের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। লোকজন যখন শহরে একত্রে বসবাস করে এবং পারিবারিক ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তখন পারস্পরিক কলহ-বিবাদও সৃষ্টি হয়। যদি তাদেরকে কলহের ভেতর ছেড়ে দেয়া হয়, তবে লড়াই করে করে ধ্বংস হয়ে যাবে। এসব কারণে অনেক শিল্পের উদ্ভব হয়। প্রথমত, জরিপ শাস্ত্র। এর দ্বারা ভূমির পরিমাণ জানা যায় এবং কলহ দেখা দিলে সঠিকভাবে সমান বন্টন করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত, সামরিক বিদ্যা, যাতে তরবারির জোরে চোর-ডাকাতের কবল থেকে নগরের হেফাযত করা যায়। তৃতীয়ত, পঞ্চায়েত ও শাসনবিদ্যা, যাতে ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি হয়। চতুর্থত, ফিকাহ; অর্থাৎ শরীয়তের আইন, যা দ্বারা মানুষের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম থাকে এবং পারস্পরিক লেন-দেনে সীমা লংঘন না হয়। এসবের প্রত্যেকটির জন্যে নির্দিষ্ট গুণের অধিকারী লোকের প্রয়োজন।

এখন দেখা দরকার, শুরুতে কেবল অন্ন , বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু পরিণামে কত ঝামেলা দেখা দিয়েছে। দুনিয়ার সব কাজ-কারবারের অবস্থা তাই। এক কাজ শুরু করলে দশ কাজ সামনে এসে হাযির হয়। এরপর সীমাহীন কাজ আসতেই থাকে। দুনিয়া যেন একটি তলাহীন দোযখ। মানুষ যখন এর এক গর্তে পতিত হয়, তখন সেখান থেকে অন্য গর্তে পিছলে পড়ে। মানুষের চারপাশে কেবল কাজই কাজ। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই তার সব কাজের উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে সে নিজেকে এবং নিজের পরিণতিকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। দুনিয়ার কর্ম ব্যস্ততার কারণে তাদের চক্ষু উন্মোচিত হয় না। খাদ্য অন্বেষণের চেষ্টা করাই যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য। যারা কৃষি ও কারিগরি কাজে লিপ্ত, তারা দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি পায় না এবং ধর্ম-কর্মে মনোযোগ দেয় না। রাতের খাদ্যের জন্যে সারাদিন পরিশ্রম করে এবং রাতে দিনের বেলার পরিশ্রম করার জন্যে খাদ্য গ্রহণ করে। তারা আমৃত্যু এমনিভাবে কলুর বলদের মত নির্দিষ্ট কাজ করে যায়।

কিছু লোকের ধারণা, শরীয়তের উদ্দেশ্য কাজকর্ম করেই ক্ষান্ত থাকা

এবং জীবনের আনন্দ ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকা নয়; বরং উদরের খাহেশ ও যৌন বাসনা পূর্ণ করাই সৌভাগ্য। ফলে, তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে নারী সম্ভোগে ও সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তারা এগুলোকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে নিয়েছে।

অন্য এক দল মানুষ মনে করেছে, অর্থ-সম্পদ ও ধন-ভাণ্ডারের প্রাচুর্যই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। ফলে, তারা রাতদিন কেবল অর্থ সংগ্রহের চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। এজন্যে কঠোর পরিশ্রম করে এবং দূর-দূরান্তের সফর করে। প্রয়োজন ছাড়া কার্পণ্যবশত অর্থ ব্যয় করে না। আশি ও নিরানব্বইয়ের চক্করে পড়ে থাকে। মৃত্যুর পর তাদের উপার্জন হয় ভূ-গর্ভেই থেকে যায়, না হয় কোন "খাদক" ব্যক্তির হাতে পড়ে যায়। সে তো বিলাসিতা করে; কিন্তু যে পাই পাই করে সঞ্চয় করেছিল, সে বিপদ ও শাস্তিতে গ্রেফতার থাকে। অন্য সঞ্চয়কারীরা এই অবস্থা স্বচক্ষে দেখে কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ করে না।

কিছু লোক ধারণা করে, সৌভাগ্য সুখ্যাতির মধ্যে সীমিত। মানুষ তাদের সুবেশ ও ভদ্রতার প্রশংসা করুক, তারা তাই চায়। ফলে, তারা যা কিছু উপার্জন করে, তার সামান্য অংশ পানাহারে ব্যয় করে। অবশিষ্ট সকল সম্পদ পোশাক ও চিত্তাকর্ষক যানবাহনে ব্যয় করে। ঘরের দরজা এবং অন্যান্য যে সব জায়গায় মানুষের দৃষ্টি পড়ে, সেগুলোকে কারুকার্য খচিত ও সুসজ্জিত করে রাখে, যাতে মানুষ তাদেরকে বিত্তশালী মনে করে।

আরও কিছু সংখ্যক লোক মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও সম্মানিত হওয়াকেই সৌভাগ্য মনে করে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাতে মানুষ তাদের আনুগত্য করে। তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং সরকারী দায়িত্ব পেলে প্রচুর আহলাদিত হয়। অধিকাংশ গাফেল লোকের মাঝে এই মনোভাব বিদ্যমান। জনগণের আনুগত্যের মহব্বতে তারা আল্লাহর আনুগত্য, এবাদত ও আখেরাতের চিন্তা বিসর্জন দেয়।

এসব দল ছাড়া আরও সত্তরেরও অধিক দল রয়েছে, যারা নিজেরাও গোমরাহ এবং অপরকেও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করার কাজে লিপ্ত। এটা কেবল এ কারণে যে, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজনে তারা ভুলে গেছে, এগুলো কি কারণে প্রয়োজন এবং এগুলোর কি পরিমাণ যথেষ্ট? অতএব, যে ব্যক্তি এই কারণ ও পরিমাণ জানবে, সে একথাও

জানবে যে, তার কাজ ও ব্যবসায়ের অংশ শুধু তার দেহের দেখাশুনা করা। সে যদি এই অংশও হ্রাস করে, তবে তার সকল কর্মব্যস্ততা দূর হয়ে যাবে এবং সে পূর্ণ অবসরে থেকে কায়মনোবাক্যে আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে।

এপর্যন্ত সে সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হল, যারা দুনিয়ার কাজ-কারবারে নিমজ্জিত থাকে। এখন শুনা দরকার যে, কিছু লোক এর বিপরীতে দুনিয়ার প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হয়ে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এতে বিদ্বেষপরায়ণ শয়তান তাদের মনে নানাবিধ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ তাদের কেউ কেউ মনে করে, দুনিয়া পরিশ্রম ও বিপদাপদের জায়গা এবং আখেরাত সৌভাগ্যের আবাসস্থল। যে আখেরাতে পৌঁছে, সে সৌভাগ্যে প্রবেশ করে—এবাদত করুক বা না করুক। এতে তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, পার্থিব শ্রম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়া উত্তম (হিন্দু যোগীদের মধ্যে একদলের তাই বিশ্বাস)। তারা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মা হুতি দেয়। তারা মনে করে, এভাবে পার্থিব শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং আখেরাতের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যাবে।

কেউ কেউ মনে করে, আত্মহত্যা করে মুক্তি পাওয়া যায় না। বরং প্রথমে মানবীয় গুণসমূহ বিলুপ্ত করতে হবে এবং কাম ও ক্রোধকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে হবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। ফলে, কিছু সংখ্যক তো সাধনার সময়ই মারা যায় এবং কিছুসংখ্যক উন্মাদ ও বদ্ধপাগল হয়ে যায়। কেউ কেউ সিদ্ধি লাভে অক্ষম হয়ে শরীয়তের উপর থেকেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

এগুলো ছাড়া আরও অনেক বাতিল মতবাদ ও পথভ্রষ্টতা প্রচলিত রয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা সত্তরের কিছু বেশী। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একটি দল মুক্তি পাবে। এই দলটিতে তারাই রয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের তরীকা অনুসরণ করে। অর্থাৎ, যাদের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়া সম্পূর্ণ বর্জনীয় নয়; বরং দুনিয়া থেকে পাথেয় পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত এবং খাহেশের মূলোৎপাটন ততটুকুই করা দরকার, যতটুকু শরীয়তের নির্দেশ।

নবম অধ্যায়

কৃপণতার নিন্দা ও ধন-সম্পদের মহব্বত

দুনিয়ার ফেতনা ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু সবচাইতে বড় ফেতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ। এর মধ্যে দুঃখ-কষ্টও বেশী। অনিষ্টের বেশীর ভাগ কারণ এই যে, ধন-সম্পদ থেকে কেউ বেপরওয়া নয় এবং নিরাপত্তারও কোন উপায় নেই। ধন-সম্পদ না থাকলে যে দারিদ্র্য আসে, তা মানুষকে কুফরের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। অপরপক্ষে ধন-সম্পদ থাকলে তা অবাধ্যতার কারণ হয়ে যায়, যার পরিণাম ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। মোটকথা, ধন-সম্পদ উপকার ও ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। এর উপকারগুলো উদ্ধারকারী এবং অপকারগুলো ধ্বংসকারী। কোন্ ধন-সম্পদ উত্তম এবং কোন্‌গুলো মন্দ, তা চেনা সুকঠিন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কেউ তা জানতে পারে না। তাই পৃথকভাবে এটিকে বর্ণনা করা নেহায়েত জরুরী।

পূর্বোক্ত অধ্যায়ে সাধারণ দুনিয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, ধন-সম্পদের দিক দিয়ে নয়। কেননা, দুনিয়া বলা হয় মানুষের জীবনের অনেকগুলো অংশকে। তন্মধ্যে ধন-সম্পদও একটি অংশ। এ অধ্যায়ে আমরা কেবল ধন-সম্পদের বিষয় বর্ণনা করব। কারণ, এতে বিপদাপদ ও ক্ষতি অনেক বেশী। ধন-সম্পদের অভাবে মানুষ দারিদ্র্যের বিশেষণে বিশেষিত হয় এবং এর উপস্থিতিতে ধনাঢ্যতার বিশেষণ এসে যায়। এই উভয় বিশেষণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

দরিদ্র ব্যক্তির দুই অবস্থা— অল্পে তুষ্টি ও লোভ। প্রথম অবস্থাটি প্রশংসনীয় এবং দ্বিতীয়টি নিন্দনীয়। লোভীরও দুই অবস্থা। এক, মানুষের ধন-সম্পদে লোভ করা এবং দুই, অপরের ধন-সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে কারিগরি ও পেশায় তৎপর হওয়া। উভয় অবস্থার মধ্যে অপরের ধন-সম্পদে লোভ করা মস্তবড় বিপদ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরও দুই অবস্থা—অপব্যয় ও

মিতব্যয়িতা। তন্মধ্যে উত্তম মিতব্যয়িতা। এসব বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিধায় এগুলো বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরী।

নিম্নে আমরা চৌদ্দটি বর্ণনায় এর বিশ্লেষণ পেশ করছি।

ধন-সম্পদের নিন্দা ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

ياايها الذين امنوا لاتلهكم اموالكم ولااولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون –

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল না করে দেয়। যারা তা করে অর্থাৎ গাফেল হয়ে যায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم –

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো অনিষ্টকারী বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

ان الانسان ليطغى ان راه استغنى

অর্থাৎ, মানুষ নিজেকে ধনাঢ্য দেখে বলেই ঔদ্ধত্য করে।

الهكم التكاثر

অর্থাৎ, প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে।

হাদীসে বলা হয়েছে— ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের মহব্বত অন্তরে নিফাক (কপটতা) সৃষ্টি করে। যেমন পানি দ্বারা শাক উৎপন্ন হয়। আরও বলা হয়েছে— যদি ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তারা এতটুকু ক্ষতি করবে না, যতটুকু ধন-সম্পদ ও আভিজাত্যের মহব্বত মুসলমানের ধর্মের ক্ষতি করে। একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক দুষ্ট কারা? তিনি বললেন ঃ ধনাঢ্যরা। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে— তোমাদের পরে সত্বরই এমন লোক হবে, যারা মিহিন ও রকমারি খাদ্য খাবে, উৎকৃষ্ট ও

দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হবে, সুন্দরী ও সুগঠিত নারীদেরকে বিয়ে করবে, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে, সামান্য বস্তুতে তাদের উদরপূর্তি হবে না এবং অনেক পেয়েও তুষ্ট হবে না। তারা দুনিয়ারই সেবাদাস হয়ে থাকবে। সকাল-সন্ধ্যায় দুনিয়াই দৃষ্টিতে থাকবে এবং আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়াকেই উপাস্য ও প্রতিপালক জ্ঞান করবে। তোমাদের মধ্যে অথবা তোমাদের পরবর্তী লোকদের মধ্যে যে কেউ সেই যুগে থাকে, তাকে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে কসম, সে যেন এরূপ লোকদের সালাম না করে, তাদের রোগীদেরকে দেখতে না যায়, তাদের জানাযায় যোগদান না করে এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে। যে এরূপ করবে, সে ইসলামের ভিত ভূমিসাৎ করার কাজে উদ্যোক্তা ও সাহায্যকারী হবে।

আরও বলা হয়েছে— দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্যে ছেড়ে দাও। কেননা, যে কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় দুনিয়া অর্জন করবে, সে নিজের মৃত্যু অর্জন করবে অথচ, টেরও পাবে না। এক হাদীসে আছে—

يَقُولُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ

অর্থাৎ, আদম সন্তান বলে ঃ আমার ধন, আমার ধন! অথচ তোমার ধন তাই, যা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করেছ অথবা পরে ছিন্ন করে দিয়েছ অথবা দান করে হস্তান্তর করেছ। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি মৃত্যু চাই না। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কি কিছু ধন-সম্পদ আছে? সে বলল ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার এই ধন-সম্পদ আখেরাতের জন্য ব্যয় করে ফেল। কেননা, ঈমানদারের অন্তর তার ধন-সম্পদের সাথে থাকে। আখেরাতের জন্যে দিয়ে দিলে সে নিজেও তার ধন-সম্পদের সাথে মিলিত হতে চাইবে। আর যদি ধন-সম্পদ পেছনে রেখে যায়, তবে সে-ও তার সাথে দুনিয়াতে থাকতে চাইবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ মানুষের বন্ধু তিনটি। তন্মধ্যে এক বন্ধু মৃত্যু পর্যন্ত সাথে থাকে। দ্বিতীয় কবর পর্যন্ত এবং তৃতীয় কিয়ামত পর্যন্ত সাথে থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে ধন-সম্পদ। কবর পর্যন্ত পরিবারের লোকজন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে তার আমলসমূহ।

একবার সহচররা হযরত ঈসা(আঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আপনি পানির উপর দিয়ে চলেন অথচ আমাদের দ্বারা তা হয় না—এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে দীনার ও আশরফীর কোন মূল্য আছে কি? তারা জওয়াব দিল ঃ হাঁ, আমরা এগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকি। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে এতদুভয় বস্তু এবং মাটির ঢিলা সমান।

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হযরত আবু দারদার কাছে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন—প্রিয় ভাই, এতটা দুনিয়া সঞ্চয় করো না, যার শুকরিয়া তুমি আদায় করতে পার না। আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি—যে ধনী ব্যক্তি তার ধন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করবে, কিয়ামতে তাকে ধনসহ উপস্থিত করা হবে। সে যখন পুলসিরাতের এদিক-ওদিক ঝুঁকে পড়বে, তখন তার ধন বলবে, চলতে থাক। তুমি তো আমার মধ্য থেকে আল্লাহর হক দিয়ে দিয়েছ। এরপর এমন ধনী ব্যক্তি পুলসিরাতে আসবে, যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ধন ব্যয় করেনি। তার ধন তার কাঁধে চাপানো থাকবে। যখন সে পুলসিরাতে হেলতে দুলতে থাকবে, তখন তার ধন বলবে, তোর জন্যে দুর্ভাগ্য! তুই আল্লাহর হক আদায় করিসনি। অবশেষে সে হায় হায় করতে থাকবে।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও দারিদ্র্যের অধ্যায়ে আমরা ধনাঢ্যতার নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেছি। সেগুলোর সারমর্মও ধন-সম্পদের নিন্দা। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দুনিয়ার নিন্দায় যা বর্ণিত হয়েছে, তাও ধন-সম্পদের নিন্দারই অন্তর্ভুক্ত। এ অধ্যায়টি বিশেষভাবে ধন-সম্পর্কিত। সেমতে হাদীসে আছে—

اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ

অর্থাৎ, যখন বান্দা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন ফেরেশতারা বলে ঃ সে আগে কি পাঠিয়েছে? আর মানুষ বলে ঃ সে পেছনে কি রেখে গেল?

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু দারদার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তিনি

বললেন ঃ ইলাহী, যে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, তাকে সুস্থ ও মুক্ত রাখ। তার আয়ু বৃদ্ধি কর এবং তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান কর। এখানে দেখা উচিত যে, দৈহিক সুস্থতা ও আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে অত্যধিক পরীক্ষা মনে করা হয়েছে। কেননা, এতে অবাধ্যতা অবশ্যই হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ) একবার হাতের তালুতে একটি দেরহাম রেখে বললেন ঃ তুই এমন বস্তু যে, আমার কাছ থেকে প্রস্থান না করা পর্যন্ত আমার কোন কাজেই লাগবি না।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহশের খেদমতে কিছু অর্থ পাঠান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই অর্থ কিসের? লোকেরা বলল ঃ খলীফা হযরত উমর আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা উমরকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি একটি পর্দা খুলে সেটাকে টুকরা টুকরা করে থলে সেলাই করলেন এবং সমস্ত অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও এতীমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ ইলাহী, এ বছরের পর যেন আমার কাছে উমরের দান না আসে। তাই হল। পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইন্তেকাল করলেন।

হযরত হাসান বলেন ঃ অর্থ-কড়ি যাকে সম্মান দান করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করেন।

বর্ণিত আছে, যখন প্রথম প্রথম আশরফী তৈরী হল, তখন ইবলীস তাকে নিজের মাথায় রাখল, অতঃপর চুম্বন করে বলল ঃ যে তোমাকে মহব্বত করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আমার গোলাম হবে।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ টাকা-পয়সা একটি বিচ্ছু। যে এর মন্ত্র জানে না, সে যেন এটা গ্রহণ না করে। কেননা, দংশন করলে এর বিষক্রিয়ায় প্রাণ নাশ হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এর মন্ত্র কি? তিনি বললেন ঃ হালাল পথে উপার্জন করা এবং সৎপথে ব্যয় করা।

মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেদমতে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে গমন করে বলেন ঃ আপনি এমন কাজ করেছেন, যা এর পূর্বে কেউ করেনি। আপনি নিজের সন্তানদের জন্যে কোন টাকা-পয়সা রেখে যাননি। তিনি বললেন ঃ আমি তাদের কোন হক দাবিয়ে

রাখিনি এবং অন্যের হকও তাদেরকে দেইনি। এছাড়া আমার সন্তানরা দু'রকমের হতে পারে। তারা আল্লাহর আনুগত্যশীল হবে অথবা নাফরমান। যদি আনুগত্যশীল হয়, তবে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ, তিনি সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবক।

আর যদি তারা গোনাহগার ও নাফরমান হয়, তবে তাদের জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই; যা হবার তাই হবে।

একবার মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী অনেক ধন-সম্পদ লাভ করেন। লোকেরা বলল ঃ এই বিপুল ধন-সম্পদ আপনার পুত্রের জন্যে রেখে দিলে ভাল হয়। তিনি বললেন ঃ না; বরং এই ধন-সম্পদ নিজের জন্যে আল্লাহর কাছে জমা রাখব এবং আল্লাহকে আমার পুত্রের জন্যে ছেড়ে যাব।

ধন-সম্পদের সংজ্ঞা এবং তার প্রশংসা ও নিন্দা ঃ আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে ধন-সম্পদকে কয়েক জায়গায় "খায়র" (কল্যাণ) শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এরশাদ হয়েছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا .. الخ — যদি খায়র অর্থাৎ ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়।

ধন-সম্পদের প্রশংসা করে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ

সৎলোকের জন্যে সৎ ধন-সম্পদ কতই না চমৎকার!

এছাড়া দান-খয়রাত ও হজ্জের যে সওয়াব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও ধন-সম্পদেরই প্রশংসা। কেননা, ধন-সম্পদ ছাড়া হজ্জও হতে পারে না, দান-খয়রাতও হতে পারে না। কোরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বান্দার প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا

অর্থাৎ, এবং তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা

বাড়িয়ে দেন এবং তৈরী করেন তোমাদের জন্যে বাগ-বাগিচা এবং তৈরী করেন নদ-নদী।

এক হাদীসে আছে— كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফর হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

এটাও ধন-সম্পদেরই প্রশংসা।

আবার অন্যত্র অনেক জায়গায় ধন-সম্পদের নিন্দাও করা হয়েছে। এই প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে সমন্বয় বুঝা যাবে না, যে পর্যন্ত ধন-সম্পদের রহস্য, উদ্দেশ্য, বিপদাপদ ও প্রয়োজন জানা না যায়। এ বিষয়টিই জানলে বুঝা যায়, ধন-সম্পদ এক কারণে উত্তম এবং এক কারণে নিকৃষ্ট। উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে প্রশংসনীয় এবং নিকৃষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে নিন্দনীয়। কেননা, ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই কল্যাণ নয় এবং সম্পূর্ণই অকল্যাণ নয়। বরং এটা কল্যাণ ও অনিষ্ট উভয়ের কারণ। যে বস্তু উভয়ের কারণ হবে, তার কখনও প্রশংসা এবং কখনও নিন্দা করা হবে।

জ্ঞানী ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আখেরাতের সৌভাগ্য। বাস্তবেও তা অক্ষয় সম্পদ ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিবর্গ এর জন্যেই আগ্রহী। সেমতে হাদীসে আছে, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন— সর্বাধিক মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তিনি বললেন ঃ اَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَ اَشَدُّهُمْ لَهُ اِسْتِعْدَادًا

অর্থাৎ, যে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্যে অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তিনটি ওসীলা ছাড়া দুনিয়াতে পারলৌকিক সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। এক, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন এলম ও সচ্চরিত্রতা। দুই, দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন সুস্বাস্থ্য। তিন, বাইরের শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

মোটকথা, অর্থ-সম্পদও বাইরের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অন্যতম। এর মধ্যে নিম্নতম হচ্ছে আশরফী, টাকা। এগুলো খাদেম। এদের খাদেম কেউ নেই। অন্য বস্তুর কারণে এগুলো কামনা করা হয়। স্বয়ং এগুলোর সত্তা উদ্দেশ্য নয়।

সারকথা, ধন-সম্পদ অন্যান্য উদ্দেশ্য অর্জনের উপায় হয়ে থাকে। সুতরাং উদ্দেশ্য ভাল হলে ধন-সম্পদও ভাল হবে। এতে জানা গেল, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অধিক দুনিয়া গ্রহণ করে, সে যেন জেনে-শুনে নিজের মৃত্যুকে গ্রহণ করে। এ কারণেই পয়গম্বরগণ এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হাদীসে আছে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كِفَافًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ পরিবারের রুযী এই পরিমাণে নির্ধারণ কর, যাতে তাদের চলে যায়।

আরও বলা হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখ, মিসকীনরূপে মৃত্যু দাও এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর।

ধন-সম্পদের বিপদাপদ ও উপকারিতা ঃ প্রকাশ থাকে যে, ধন-সম্পদের ভেতরে সাপের বিষও আছে এবং বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী গুণও আছে। বিষের প্রতিক্রিয়া বিনাশকারী গুণ হচ্ছে তার উপকারিতা। যে ব্যক্তি উপকারিতা ও বিপদাপদ উভয়টি জানে, তার পক্ষে ধন-সম্পদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা এবং কল্যাণপ্রার্থী হওয়া সম্ভব।

ধন-সম্পদের পার্থিব উপকারিতা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এর উপকারিতা সুবিদিত। যদি তারা এতে উপকারিতা না দেখত, তবে এর অন্বেষণে প্রাণান্তকর চেষ্টা কেন করত? কিন্তু এর ধর্মীয় উপকারিতা তিন প্রকারে সীমিত।

প্রথম প্রকার হচ্ছে ধন-সম্পদকে নিজের জন্যে ব্যয় করা অথবা এবাদতে ব্যয় করা অথবা এবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্যে ব্যয় করা। এবাদতে ব্যয় করা যেমন হজ্জ কিংবা জেহাদে ব্যয় করা। কেননা, এদুটি মৌলিক এবাদত ধন-সম্পদ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত

ব্যক্তি এসব এবাদতের সওয়াব পেতে পারে না। এবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্য ব্যয় করার অর্থ পোশাক, খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ব্যয় করা। এতে এবাদতের শক্তি অর্জিত হয়। কেননা, এসব প্রয়োজন অর্জিত না থাকলে অন্তর ধর্মকর্মের সময় ও সুযোগ পায় না। যে বস্তু ছাড়া এবাদত সম্পন্ন হয় না, তা অর্জন করাও এবাদত। সুতরাং প্রয়োজন পরিমাণে ধন-সম্পদ অর্জন করা ধর্মীয় উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। একে বিলাসিতায় ব্যয় করা অবশ্য দুনিয়ার অংশ।

দ্বিতীয় প্রকার, যা অন্যান্য মানুষের জন্যে ব্যয় করা হয়। তা চার প্রকার— সদকা দেয়া, মানবিক কারণে দেয়া, ইয্যত রক্ষার্থে দেয়া এবং চাকর-বাকরকে পারিশ্রমিক দেয়া। সদকার সওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এতে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ প্রশমিত হয়। মানবিক কারণে ব্যয় করার অর্থ ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের দাওয়াতে, উপঢৌকন ইত্যাদিতে ব্যয় করা। একে সদকা বলা হয় না। কারণ, সদকা তাই, যা অভাবগ্রস্তকে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও এ ধরনের ব্যয় ধর্মীয় উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মানুষ এই ব্যয় দ্বারা অপরকে বন্ধু ও ভাই বানিয়ে নেয় এবং এতে দানশীলতার গুণ অর্জিত হয়। সুতরাং এ ধরনের ব্যয়েও অনেক সওয়াব। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

ইয্যত রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ অপরকে নিন্দা, গীবত ও শত্রুতা থেকে বিরত রাখার জন্যে ব্যয় করা। এর উপকারিতা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও এটা ধর্মীয় উপকারিতার অন্যতম। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

مَاوَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

অর্থাৎ, মানুষ যার দ্বারা তার ইযযত রক্ষা করে, তা তার জন্যে সদকা হিসাবে লেখা হবে।

এটা সদকা হবেই না কেন? এ ব্যয়ের কারণেই গীবতকারী গীবত থেকে বিরত থাকে। শত্রুতা ও হিংসাবশত যেসব কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে, সেগুলোও এরূপ ব্যয়ের ফলে মওকুফ থাকে।

চাকর-বাকরকে পারিশ্রমিক দেয়ার অবস্থা এই যে, মানুষ তার সাজসরঞ্জাম তৈরীতে যে সকল কাজের মুখাপেক্ষী হয়, সেগুলো অনেক। এ

সকল কাজ নিজে করলে অনেক সময় বিনষ্ট হয় এবং আখেরাতের চিন্তা ও যিকর করা কঠিন হয়।

তৃতীয় প্রকার, সে ব্যয় কোন নির্দিষ্ট মানুষের জন্যে নয়; বরং তাতে ব্যাপক জনগণের উপকার হয়। যেমন, মসজিদ, পুল, সরাইখানা, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, কূপ নির্মাণ করা অথবা খয়রাতের জন্যে ভূমি ও বিষয় সম্পত্তি ওয়াকফ করা। এধরনের ব্যয় দ্বারা মৃত্যুর পরও সওয়াব হয় এবং যে ব্যয় করে, তার জন্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দোয়া হতে থাকে। সুতরাং এর চেয়ে অধিক কল্যাণকর কাজ আর কি হবে?

ধন-সম্পদের বিপদাপদও দুই প্রকার- ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় বিপদ তিনটি। প্রথম এই যে, ধন-সম্পদ থাকার কারণে মানুষ ক্রমশ গোনাহ করতে শুরু করে। কেননা মানুষের মধ্যে খাহেশের দাবী সবসময়ই বিদ্যমান। তবে নিঃস্বতার কারণে কিছু করতে পারে না। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা পায়, তখন আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তখন খাহেশ অনুযায়ী গোনাহ করতে শুরু করলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর সবর করলে দুঃখ ভোগ করে। কারণ, ক্ষমতা সত্ত্বেও সবর করা সুকঠিন। দ্বিতীয় এই যে, ধন-সম্পদ থাকলে মোবাহ বস্তু দ্বারা বিলাসিতা শুরু হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধনী, তার জন্যে যবের রুটি খাওয়া , মোটা বস্ত্র পরিধান করা এবং সুস্বাদু খাদ্য থেকে সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। অতএব, সে অবশ্যই সুখাদ্য খাবে এবং উত্তম পোশাক পরবে। তার অভ্যাস এভাবেই গড়ে উঠবে। এটা ছাড়া সে সবর করতে পারবে না। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে এক অভ্যাস থেকে অন্য অভ্যাস দেখা দিতে থাকবে। যখন সে বিলাসিতার প্রতি অধিক মাত্রায় ঝুঁকে পড়বে, তখন এমনও হবে যে, হালাল উপার্জন দ্বারা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। ফলে, সন্দেহযুক্ত অর্থ-সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হবে।

তৃতীয় বিপদ যা থেকে কেউ মুক্ত নয় তা এই যে, মানুষ ধন-সম্পদের সংশোধন ও গোছগাছ করার কাজে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। আল্লাহর স্মরণে যা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তা ক্ষতির বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণেই হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ ধন- সম্পদের মধ্যে তিনটি বিপদ। এক, হালাল উপার্জন না করা। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ যদি কেউ হালাল উপার্জন করে, তবে? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে দ্বিতীয় বিপদের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ সেই উপার্জন হক পথে ব্যয় না করা। লোকেরা বলল ঃ

যদি হক পথে ব্যয়ও করে? তিনি বললেন ঃ তা হলে তৃতীয় বিপদ সামনে আসবে; অর্থাৎ তা সামলাতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। কেননা, সকল এবাদতের মূল হচ্ছে আল্লাহর যিকর ও তাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে ফিকর। এই যিকর ও ফিকরের জন্যে অবসর মুহূর্ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ধনী ব্যক্তি দিবারাত্র অসংখ্য ঝামেলার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে।

লোভ-লালসার নিন্দা এবং অল্পে তুষ্টির প্রশংসা ঃ দরিদ্র থাকা একটি উত্তম বিষয়; কিন্তু দরিদ্রের উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা এবং অন্যের ধন-দৌলতের প্রতি তাকিয়ে না থাকা। ধনীদের কাছে কোন কিছুর লোভ না করা। এটা তখন অর্জিত হবে, যখন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান থেকে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু নিয়েই তুষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে নিজের আশাকে একদিন অথবা এক মাসের চেয়ে বেশী দীর্ঘ না করাও উচিত। যদি কেউ অধিক ধন ও দীর্ঘ আশায় আগ্রহী হয়, তবে সে অল্পে তুষ্টির ইয্যত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং লোভের নাপাকী দ্বারা কলুষিত হবে। মানুষের সৃষ্টি ও মজ্জায় লোভ-লালসা নিহিত আছে। সেমতে হাদীসে আছে ঃ

لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى وَرَاءَ هُمَا ثَالِثًا
وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

অর্থাৎ, যদি আদম সন্তানের দুটি স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে সে এগুলোর পরও তৃতীয়টি চাইবে। মাটিই কেবল মানুষের উদরপূর্তি করে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمُ الْعِلْمِ وَمَنْهُوْمُ الْمَالِ

অর্থাৎ, দুই লোভী কখনও তৃপ্ত হয় না— জ্ঞানের লোভী ও অর্থের লোভী।

আরও বলা হয়েছে ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ فِيْهِ اثْنَانِ الْاَمَلُ وَحُبُّ الْمَالِ

অর্থাৎ, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় কিন্তু তার আশা ও অর্থের মোহ যুবক হতে থাকে।

অর্থের প্রতি মানুষের এই মজ্জাগত লোভ-লালসার কারণেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) "কানায়াত" তথা অল্পে তুষ্টির প্রশংসা করেছেন। সেমতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ يُّهْدٰى اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كِفَافًا وَّقَنَعَ بِهٖ

অর্থাৎ, সে ব্যক্তির জন্যে মোবারকবাদ, যাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করা হয়, যার জীবিকা জীবন ধারণ পরিমাণে সীমিত হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলাকে প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া ইলাহী! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে অধিক ধনী? এরশাদ হল ঃ যে আমার দানে অধিকতর তুষ্ট থাকে। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ অধিক ন্যায়পরায়ণ কে? উত্তর হল ঃ যে নিজের সাথে ইনসাফ করে। হযরত আবু হুরাইয়রা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন, হে আবু হুরায়রা, যখন তুমি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত হও, তখন একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানিকে যথেষ্ট মনে কর এবং দুনিয়াকে লাথি মার। তাঁরই রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ পরহেযগারী অবলম্বন কর। সকলের মধ্যে অধিক এবাদতকারী হয়ে যাবে। অল্পে সন্তুষ্ট থাক। সকলের মধ্যে অধিক শোকরকারী হয়ে যাবে। অন্যের জন্যে তাই কামনা কর, যা নিজের জন্যে কামনা করে থাক। এতে ঈমানদার হয়ে যাবে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) লোভ করতে নিষেধ করেছেন। সেমতে আবু আইউব আনসারী বর্ণনা করেন- জনৈক বেদুইন হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কোন সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ বিদায়ী ব্যক্তির মত নামায পড়। এমন কথা বলো না, যার আগামীকাল ওযর পেশ করতে হয়। অন্যের হাতে যা আছে, তার প্রতি আশা করো না অর্থাৎ লোভ করো না।

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী বলেন ঃ আমরা সাত অথবা আট অথবা নয় ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে বায়াত কর না কেন?

আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি বায়াত করিনি? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে বায়াত করনি। অতঃপর আমরা বায়াতের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলাম। এমন সময় আমাদের একজন বলে উঠল ঃ আমরা তো পূর্বে বায়াত করেছি। এখন কোন্ বিষয়ের জন্যে এই বায়াত? তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ের জন্যে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। পাঞ্জেগানা নামায পড়বে। সাগ্রহে আনুগত্য করবে। এরপর একটি কথা আস্তে বললেন ঃ মানুষের কাছে কিছু চাইবে না। বর্ণনাকারী আওফ বলেন ঃ এই লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এই বায়াতটি এমনভাবে পালন করেন যে, তাদের চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও কাউকে তুলে দিতে বলতেন না। অর্থাৎ, তারা চাওয়া থেকে এতটুকু বেঁচে থাকতেন।,

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ লোভ হচ্ছে দরিদ্রতা এবং মানুষের কাছে আশা না করা ধনাঢ্যতা। যে অপরের কাছে কোন কিছু আশা করে না, সে অমুখাপেক্ষী থাকে। জনৈক দার্শনিককে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ ধনাঢ্যতা কি? উত্তর হল ঃ আশা কম করা এবং যতটুকুতে চলে, ততটুকুতে তুষ্ট হওয়ার নাম ধনাঢ্যতা। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ তোমার জন্যে দুনিয়া তখন উত্তম, যখন তুমি তাতে লিপ্ত না হবে। আর পার্থিব ধন-সম্পদের মধ্যে তোমার জন্যে তাই উত্তম, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়; অর্থাৎ, খয়রাতে ব্যয় হয়ে যায়।

লোভ-লালসার প্রতিকার এবং অল্পে তুষ্টি অর্জনের উপায় ঃ লোভ-লালসার প্রতিকার তিনটি একক বিষয় দ্বারা গঠিত। তা হল সবর, এলম ও আমল। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এগুলো এসে যায়। প্রথমত আমল অর্থাৎ, জীবিকায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা এবং মিতব্যয়ী হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টির গৌরব অর্জন করতে চায়, সে যেন যথা সম্ভব খরচের দ্বার রুদ্ধ রাখে। কেননা, যার ব্যয়ের মাত্রা বেশী হবে, সে অল্পে তুষ্ট হতে পারবে না। উদাহরণতঃ একা হলে একটি মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং কম রুটি ও কম তরকারি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। আর সন্তান-সন্ততি থাকলে তাদের প্রত্যেককেই এভাবে ভরণ-পোষণ দেবে। কেননা, এতটুকু জীবিকা সামান্য পরিশ্রমেই অর্জিত হতে পারে। এতে

অন্বেষণও কম হবে এবং জীবন মধ্যবর্তী পথে অতিবাহিত হবে, যা অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে মূল বিষয়। একেই বলা হয় “রিফক ফিল ইনফাক” অর্থাৎ, অর্থ ব্যয়ে নম্রতা করা। হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যাপারে নম্রতা পছন্দ করেন।

আরও বলা হয়েছে- مَاعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

অর্থাৎ. যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হয় না। আরও আছে—

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَالْقَصْدُ فِى الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَالْعَدْلُ فِى الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ -

অর্থাৎ, উদ্ধারকারী বিষয় তিনটি— গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, ধনাঢ্যতায় ও দারিদ্র্যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও ক্রোধের অবস্থায় ন্যায় বিচার করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مَنِ اقْتَصَدَ اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ بَذَّرَ فَقَّرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَحَبَّهُ اللّٰهُ -

অর্থাৎ, যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে ধনী করেন। যে অপব্যয় করে, আল্লাহ তাকে ফকীর করে দেন। আর যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে প্রিয় করে নেন।

এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় সংকোচন করা একান্ত জরুরী।

দ্বিতীয়ত যথেষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ হাতে থাকলে ভবিষ্যতের জন্যে

অস্থির হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থা অর্জন করার জন্যে আকাংখা খাটো করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যে রিযিক তাকদীরে আছে, তা অবশ্যই পৌঁছবে। এতে লোভ করা-না করা সমান। লোভ করলেই রুযী পাওয়া যায় না।

লোভ মানুষের মধ্যে শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। অভিশপ্ত শয়তান অন্তরে জাগ্রত করে যে, বেশী ব্যয় করলে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সঞ্চয় না করলে অসুস্থতা ও অক্ষমতার সময়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে। সে এমনিভাবে মানুষকে অর্থ উপার্জনের কষ্টে লিপ্ত করে। এরপর নিজে তার কান্ডকীর্তি দেখে হাসে যে, দেখ, ভবিষ্যতে কষ্টের আশংকায় বর্তমানে কেমন কষ্ট করে যাচ্ছে। এটা কিরূপে জানা গেল যে, ভবিষ্যতে কষ্ট অবশ্যই হবে। কিছুই তো না হতে পারে।

বর্ণিত আছে, হযরত খালেদ (রাঃ)-এর দুই পুত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ যে পর্যন্ত তোমাদের মাথা নড়াচড়া করে অর্থাৎ সারা জীবন রিযিক থেকে নিরাশ হয়ো না। দেখ, মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে রুযী দেন। একবার রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ইবনে মাসউদের কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি তখন বিমর্ষ অবস্থায় বসে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ দুঃখ করা অনর্থক। যা হবার তা হবেই। যে পরিমাণ রিযিক নসীবে আছে, তা আসবেই।

মানুষ যখন পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে যে, তার তাকদীরে অবশ্যই রিযিক আছে, তখনই সে লোভ-লালসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর সাথে একথাও বিশ্বাস করা উচিত যে, অন্বেষণে ত্রুটি করলেও তাকদীরের রিযিক অবশ্যই পৌঁছবে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।

হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আল্লাহকে ভয় করে, এমন কোন ব্যক্তিকে আমি অভাবগ্রস্ত দেখিনি। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ভীত ব্যক্তির প্রয়োজন অপূর্ণ রাখেন না। মুফাযযল যব্বী বলেন ঃ আমি জনৈক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি উপায়ে জীবিকা নির্বাহ কর? সে বলল ঃ হাজীগণ আসেন, এতেই আমার জীবিকা হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাজীরা চলে গেলে কি কর? এতে সে কেঁদে কেঁদে বলল ঃ অমুক জায়গা থেকে রুযী আসে বলে যদি জানাই থাকত, তবে জীবন কিসের?

তৃতীয়ত, অল্পে তুষ্টির উপকারিতা জানতে হবে যে, এর দৌলতে অমুখাপেক্ষিতার সম্মান অর্জিত হয় এবং লোভের কারণে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। এ বিষয়টি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মানুষ অল্পে তুষ্টির প্রতিই আগ্রহী হবে।

চতুর্থত, ইহুদী, খৃস্টান, নীচ জাতি, নির্বোধ ও বেদ্বীনদের বিলাসিতা ও জীবন ধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করবে। এরপর পয়গম্বর, ওলী, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের অবস্থা দেখবে, শুনবে এবং পাঠ করবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে ইতর ব্যক্তিদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করবে, অথবা তাদের অনুসরণ করবে, যারা সৃষ্টিজগতে সর্বাধিক সম্মানিত। যদি কেউ মহাপুরুষগণের অনুসরণ করে, তবে সামান্য বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং অল্পে সবর করা সহজ হবে। তখন তার বিষয়ে পয়গম্বর ও ওলীগণ ছাড়া কেউ তার শরীক হবে না। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত শ্রেণীতে থাকা পছন্দ করে,তবে কিছুই লাভ হবে না। উদাহরণতঃ যদি উদরপূর্তির বিলাসিতায় পড়ে, তবে এতে গাধা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি সহবাসের আনন্দ লাভে ব্যাপৃত হয়, তবে শূকর এ কাজে সবার ঊর্ধ্বে। যদি অঙ্গসজ্জা ও যানবাহনের বিলাসিতা লক্ষ্য হয়, তবে অধিকাংশ কাফের এতে তার তুলনায় বেশী হবে।

পঞ্চমত, অর্থ সঞ্চয় করার বিপদ সম্পর্কে চিন্তা করবে, এতে কেমন চুরি, ডাকাতি ও লুটতরাজের আশংকা লেগে থাকে! হাত খালি থাকলে এসব দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে সুখে ও শান্তিতে থাকা যায়। এছাড়া আমরা পূর্বে যেসব আর্থিক বিপদাপদ বর্ণনা করেছি, সেগুলোও চিন্তা করবে এবং ধ্যান করবে, ধন-সম্পদের কারণে জান্নাতের দরজা থেকে পাঁচ শ' বছর পর্যন্ত দূরে থাকতে হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অল্পে সন্তুষ্ট হয় না, সে ধনীদের

দলভুক্ত হবে এবং ফকীরদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে। ফকীর ধনীর তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসসমূহে তাই বর্ণিত আছে। এই চিন্তা-ভাবনার উপায় হল দুনিয়াতে সব সময় নিজের চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন লোকদের প্রতি লক্ষ্য করা— বেশী অবস্থাসম্পন্নদের প্রতি লক্ষ্য না করা। সেমতে হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ) ওসিয়ত করেছেন যে, দুনিয়াতে তোমার চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন যারা, তাদের প্রতি দেখবে। যাদের আর্থিক অবস্থা বেশী ভাল, তাদের দিকে নজর করবে না।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে অল্পে তুষ্টি আসতে পারে। একশ' কথার এক কথা এই যে, সবর করবে, আশাকে খাটো করবে এবং বুঝবে যে, অনন্তকাল পর্যন্ত ভোগ-বিলাস ও মজা উড়ানোর জন্যে দুনিয়াতে কয়েক দিনই সবর করতে হবে। যেমন রোগী ঔষধের তিক্ততায় এজন্যে সবর করে যে, এরপরে সে সর্বদা সুস্থ থাকবে।

দানশীলতার ফযীলত ঃ যদি কারো কাছে ধন-সম্পদ না থাকে, তবে তার উচিত অল্পে তুষ্ট ও কম লোভী হওয়া। আর যদি ধন-সম্পদ থাকে, তবে ত্যাগ ও দানশীলতায় ত্রুটি না করা এবং কৃপণতা থেকে অনেক দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা, দানশীলতা পয়গম্বরগণের চরিত্রের একটি অঙ্গ। মুক্তির মূল বিষয়বস্তুও এটাই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন— দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের একটি বৃক্ষ। এর বিভিন্ন ডালপালা আভূমি লম্বিত। যে কেউ এর একটি ডাল ধরে ফেলে, সে তাকে জান্নাতে টেনে নেয়। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল পয়গম্বরকে দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতার উপরই সৃষ্টি করেছেন। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে, কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ সবর ও দানশীলতা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ দুটি অভ্যাস আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং দুটি অপ্রিয়। প্রিয় অভ্যাস দুটি হচ্ছে সচ্চরিত্রতা ও দানশীলতা এবং অপ্রিয় অভ্যাস দুটি হচ্ছে অসচ্চরিত্রতা ও কৃপণতা। আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান, তখন তাকে দিয়ে মানুষের অভাব পূরণ করান। আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার দয়ালু বান্দাদের কাছে দানের আবেদন কর এবং তাদের আশ্রয়ে জীবন

অতিবাহিত কর। আমি তাদের মধ্যে স্বীয় দয়া ও রহমত ভরে দিয়েছি। আর পাষাণহৃদয় লোকদের কাছে কিছু চেয়ো না। তাদের উপর আমি গযব নাযিল করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ দানশীল ব্যক্তির ত্রুটি ক্ষমা কর। কারণ, সে যখন ভুল করে, তখন আল্লাহ তার হস্ত ধারণ করেন। হযরত ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে আছে— অন্ন দানকারীর কাছে রিযিক এত দ্রুত পৌঁছে যে, উটের গলায় ছুরিও এত দ্রুত কার্যকর হয় না। হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বেছে বেছে নেয়ামত দান করেন, যাতে তাদের হাতে অন্যদের কার্যোদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি অপরের উপকার করতে কার্পণ্য করে, আল্লাহ তা'আলা নিজের নেয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে অন্যকে সমর্পণ করেন।

হালালী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বনী আম্বরের কয়েদীদেরকে উপস্থিত করা হলে তিনি সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেন; কিন্তু এক ব্যক্তিকে এই নির্দেশের বাইরে রাখেন। হযরত আলী (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ এক। তাঁর ধর্মও এক। যে গোনাহ এরা করেছে, তাও এক। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি তার সম্প্রদায় থেকে পৃথক হল কিরূপে? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন ঃ তাদের সকলকে হত্যা কর এবং এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। তার দানশীলতার কারণে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল। এক হাদীসে বলা হয়েছে—

طَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ وَطَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ

অর্থাৎ, দানশীলের খাদ্য ঔষধ বিশেষ আর কৃপণের খাদ্য রোগ বিশেষ।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যখন মানুষের কাছে দুনিয়া আসে, তখন তা থেকে ব্যয় করা উচিত। কেননা, ব্যয় করলে দুনিয়া চলে যাবে না। যদি চলে যায়, তবু ব্যয় করা দরকার। আমীর মোয়াবিয়া ইমাম হুসায়ন (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ ভদ্রতা, উচ্চতা ও দানশীলতা কাকে বলে? তিনি বললেন ঃ ভদ্রতা হচ্ছে নিজের ও ধর্মের হেফাযত করা এবং নিজের কাজ

উত্তমরূপে করা। উচ্চতা হচ্ছে প্রতিবেশীর বিপদ দূর করা এবং সবরের জায়গায় সবর করা। দানশীলতা হচ্ছে চাওয়া ছাড়াই অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা।

কোন এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে কোন উদ্দেশ্যে দরখাস্ত লিখে পেশ করল। তিনি সেটি না পড়েই বলে দিলেন ঃ তোমার অভাব পূরণ করা হবে। এতে অন্য একজন আরয করল ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র, আপনি তার আবেদনটি পাঠ করেই জওয়াব দিতেন। তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ আমি পাঠ করতাম, ততক্ষণ সে আমার সামনে হীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকত। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন— তুমি সওয়ালকারীকে এতক্ষণ হীন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন?

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়ালকারীকে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, সে দানশীল নয়; বরং দানশীল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের হক চাওয়া ছাড়াই পৌঁছে দেয়। মনে তার গ্রহণের জন্যে কৃতজ্ঞতার মোহ না থাকে; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণ সওয়াবপ্রাপ্তির বিশ্বাস থাকে।

হযরত হাসান বসরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দানশীলতা কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে ধন- সম্পদ দিয়ে দেয়া। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ অপব্যয় কি? তিনি বললেন ঃ ক্ষমতার মোহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। ইমাম জা'ফর সাদেক বলেন ঃ জ্ঞানের চেয়ে অধিক কোন সাহায্যকারী ধন নেই এবং মূর্খতার চেয়ে বড় কোন বিপদ নেই। পরামর্শের চেয়ে বড় কোন সমর্থন নেই। জেনে রেখ, আল্লাহ বলেন, আমি দাতা। কোন কৃপণ আমার শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কৃপণতা কুফরের অংশ। কাফেররা দোযখে যাবে। দানশীলতা ঈমানের অঙ্গ। ঈমানদার জান্নাতে যাবে।

নিম্নে খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তিবর্গের কিছু অনুসরণযোগ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সেবিকা উম্মে দাররা বর্ণনা করেন ঃ একবার হযরত ইবনে যুবায়র (রাঃ) এক লাখ আশি হাজার দেরহাম হযরত আয়েশার খেদমতে পাঠালেন। তিনি এগুলো জনসাধারণের মাঝে বন্টন করে দিলেন। সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন ঃ আমার ইফতার আন। আমি রুটি ও যয়তুনের তৈল সামনে রেখে দিলাম এবং বললাম ঃ আপনি

এতগুলো দেরহাম বন্টন করলেন। আমাদের ইফতারের জন্যে এক দেরহামের গোশত কেনাও কি সম্ভব ছিল না? তিনি বললেন ঃ তুমি আগে বললে তা অবশ্য করা যেত।

আব্বান ইবনে উসমান বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিছু ক্ষতি করতে মনস্থ করল। সেমতে সে সময় কোরায়শ সরদারদের কাছে গিয়ে মিছামিছি বলে দিল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আপনাদের সবাইকে তাঁর বাড়ীতে সকালে ভোজের দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে তিনি আমাকে বলেছেন। সরদাররা তার কথামত কাজ করল এবং সকাল বেলায় সবাই তাঁর বাড়ীতে সমবেত হল। এমনকি ঘরে জায়গা পর্যন্ত রইল না। হযরত আব্দুল্লাহ তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা ঘটনা বর্ণনা করল। শুনা মাত্রই তিনি ফল-মূল কিনে এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন এবং লোকজনকে খানা পাকানোর জন্যে নিযুক্ত করলেন। ফল খাওয়া শেষ হতে না হতেই দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া হল। অতঃপর আহারান্তে সবাই প্রস্থান করল। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সে পরিমাণ প্রত্যেক দিন ব্যয় হতে পারে কিনা? তারা বলল ঃ অবশ্যই হতে পারে। তিনি বললেন ঃ তা হলে এই সরদারগণ যেন প্রত্যহ সকালের খানা আমার ঘরেই খায়।

মুসএব ইবনে যুবায়র বর্ণনা করেন, এক বছর আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) হজ্জে গমন করেন এবং সেখান থেকে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। মদীনায় প্রবেশ করলে হযরত ইমাম হুসায়ন (রাঃ) নিজ ভ্রাতা ইমাম হাসান (রাঃ)-কে বললেন ঃ তুমি তার সাথে দেখা করতে যেয়ো না এবং সালাম-কালাম করো না। এরপর আমীর মোয়াবিয়া যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন ইমাম হাসান বললেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণ। আমি অবশ্যই আমীরের সাথে দেখা করব। সেমতে উটে সওয়ার হয়ে চলে গেলেন। পথিমধ্যে সালাম-কালামের পর তিনি ঋণের কথা বললেন। সে সময় আশি হাজার দীনার বহনকারী একটি উট আমীরের কাছে ছিল। দীনারের ভারে উট চলতে পারছিল না। তাকে জোরজবরদস্তি হাঁকিয়ে আনা হচ্ছিল। আমীর মোয়াবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, এর পিঠে কি? লোকেরা বলল ঃ আশি হাজার দীনার। তিনি বললেন ঃ এগুলো উটসহ হযরত ইমাম হাসানের কাছে পৌঁছে দাও।

ওয়াকেদ তার পিতা মোহাম্মদ ওয়াকেদীর অবস্থা বর্ণনা করেন যে, তিনি খলীফা মামুনকে এই মর্মে একটি পত্র লিখেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণের বোঝা। এখন আর সহ্য করতে পারছি না। খলীফা পত্রের অপর পিঠে এই নির্দেশ লিখলেন ঃ তোমার মধ্যে দুটি চমৎকার অভ্যাস রয়েছে— দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা। দানশীলতার কারণে তুমি নিঃস্ব হয়ে গেছ এবং লজ্জাশীলতার কারণে তুমি কখনও নিজের অবস্থা আমাকে বলনি। এখন আমি এক লক্ষ দেরহাম তোমাকে দিলাম। মনোমত হলে মানুষকে খুব দান কর। মনোমত না হলে দোষ তোমারই। তুমি যে সময় খলীফা রশীদের পক্ষ থেকে বিচারপতি ছিলে, তখন আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলে যে, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে, যুহরী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে, আনাস রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যুবায়র ইবনে আওয়ামকে বললেন ঃ হে যুবায়র, জেনে রাখ, বান্দার জন্য রিযিকের চাবি আরশের উল্টো দিকে রয়েছে। বান্দা যে পরিমাণ ব্যয় করে, আল্লাহ সে পরিমাণ তার কাছে পাঠিয়ে দেন। যে বেশী ব্যয় করে, তার জন্য বেশী এবং যে কম খরচ করে, তার জন্যে কম পাঠিয়ে দেন। ওয়াকেদী বলেন ঃ আল্লাহর কসম, খলীফা মামুনের এক লাখ দেরহাম পেয়ে আমি এমন প্রীত হলাম, যেমন এই হাদীসের বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয়ায় হলাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বসরার গভর্নর থাকাকালে একদিন সেখানকার ক্বারীগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল ঃ আমাদের এক প্রতিবেশী দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে। আপন কন্যার বিবাহ ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে দিয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে কন্যাকে যৌতুক দেয়ার মত কিছুই তার কাছে নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দাঁড়ালেন এবং আগন্তুকদের হাত ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি সিন্দুক খুলে তা থেকে ছয়টি থলে বের করলেন, অতঃপর বললেন ঃ এগুলো তুলে নাও। তারা তুলে নিলে তিনি বললেন ঃ একজন মুসলমানকে এমন জিনিস দেয়া ভাল নয়, যা তার রোযা ও রাত্রি জাগরণে বাধা সৃষ্টি করে। চল, আমরা সবাই গিয়ে তার সাহায্যকারী হয়ে কন্যাকে তুলে দেই। অবশ্য দুনিয়ার এতটুকু সাধ্য নেই যে, একজন মুমিনকে আল্লাহর এবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখে; কিন্তু আমরাও এতটুকু

অহংকারী নই যে, আল্লাহর ওলীগণের খেদমত করব না। একথা বলে তিনি সবাইকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে চলে গেলেন এবং যথারীতি বিবাহকর্ম সম্পন্ন হল।

বর্ণিত আছে, আব্দুল হামিদ ইবনে সাদ (রহঃ)-এর আমলে মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন— আমি শয়তানকে দেখিয়ে দেব আমি তার দুশমন। সেমতে তিনি সমস্ত মানুষের অভাব পূরণ করতে থাকেন। পরে যখন তিনি পদচ্যুত হলেন, তখন তার যিম্মায় সওদাগরদের দশ হাজার দেরহাম প্রাপ্য ছিল। তিনি এর বিনিময়ে সওদাগরদের কাছে পত্নীদের পঞ্চাশ হাজার দেরহাম মূল্যের অলংকার বন্ধক রেখে দিলেন। অতঃপর যখন এই অলংকার ছাড়াতে পারলেন না, তখন সওদাগরদেরকে লিখে পাঠালেন ঃ তোমরা অলংকার বিক্রি করে তা থেকে নিজেদের প্রাপ্য কেটে নাও। যা অবশিষ্ট থাকে, তা এমন লোকদেরকে দিয়ে দাও, যারা আমার কাছ থেকে কিছুই পায়নি।

আবু মুরছাদ একজন দানবীর ছিলেন। জনৈক কবি কিছু পাওয়ার আশায় তার প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি রিক্তহস্ত। তোমাকে দিতে কিছু পারছি না। তবে একটি ফন্দি করা যায়, তুমি দশ হাজার দেরহাম দাবী করে কাযীর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ কর। আমি তোমার দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নেব। এরপর অক্ষমতার কারণে তুমি আমাকে কয়েদী বানিয়ে দিয়ো। আমার পরিবারের লোক তোমাকে দশ হাজার দেরহাম দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনবে। কবি তাই করল। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই আবু মুরছাদের পরিবারের লোকেরা দশ হাজার দেরহাম দিয়ে তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে নিল।

আবুল হাসান মাদায়েনী বর্ণনা করেন, একবার হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) একত্রে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথে তারা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এক সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। তাদের চলার পথে এক বৃদ্ধা তাঁর কুঁড়ে ঘরে বসে ছিল। তারা তিনজন তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু পানি আছে? বৃদ্ধা বলল ঃ হাঁ আছে। একথা শুনে তারা উট থেকে নেমে পড়লেন। বৃদ্ধার ঘরে একটি ছোট বকরী ছিল। সে বলল ঃ এই ছাগলের দুধ বের করে পান করুন। দুধ পান

করার পর তারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু খাবারও আছে কি? বৃদ্ধা বলল ঃ এই ছাগলটি ছাড়া আমার কাছে অন্য কিছু নেই। আপনাদের কেউ যদি এটি যবাহ করে সাফ করে দেন, তবে আমি রান্না করে দিই। তাদের একজন একাজটি করলেন এবং বৃদ্ধা খানা তৈরী করে দিল। তারা পানাহার শেষ করে বিকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। চলার সময় বৃদ্ধাকে বললেন ঃ আমরা কোরায়শী। এখন হজ্জে যাচ্ছি। সেখান থেকে সহি-সালামতে দেশে ফিরলে তুমি আমাদের কাছে যেয়ো। আমরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব।

অনেক দিন পরের কথা। বৃদ্ধা তার স্বামীকে নিয়ে রোযগারের খোঁজে মদীনায় উপস্থিত হল। সেখানে পৌছে তারা উটের শুষ্ক বিষ্ঠা সংগ্রহ করে সেগুলো বিক্রয় করে কোনমতে দিন কাটাত। ঘটনাক্রমে বৃদ্ধা একদিন সে গলিতে চলে গেল, যেখানে হযরত হাসান (রাঃ) নিজের ঘরের দরজায় বসে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে দেখেই চিনতে পারলেন। সেমতে খাদেমকে পাঠিয়ে তাকে আনলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাকে চিন? বৃদ্ধা আরয করল ঃ না, চিনতে পারলাম না। তিনি বললেন ঃ অমুক দিন তোমার ঘরে অতিথি হয়েছিলাম। বৃদ্ধা মনে করে বলল ঃ হাঁ। আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক। আপনি কি সেই মেহমান? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দীনার বৃদ্ধাকে দিয়ে নিজের খাদেমদের সাথে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ভাই তোমাকে কি দিয়েছে? সে আরয করল ঃ এক হাজার দীনার ও এক হাজার ছাগল। অতঃপর তিনিও সে পরিমাণ দীনার ও ছাগল দিয়ে বৃদ্ধাকে খাদেমের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হাসান-হুসাইন ভ্রাতৃদ্বয় তোমাকে কি দিয়েছে? সে বলল ঃ তারা দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার ছাগল দিয়েছেন। অতঃপর তিনি দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার ছাগল বৃদ্ধাকে দিয়ে বললেন ঃ যদি তুমি প্রথমে আমার কাছে আসতে, তবে আমি এই পরিমাণে দিতাম যে, হাসান-হুসাইনের জন্যে তা কঠিন হত। মোটকথা, বৃদ্ধা চার হাজার দীনার ও সম সংখ্যক ছাগল নিয়ে তার স্বামীর কাছে এসে বলল ঃ এ হল একটি ছাগলের প্রতিদান, যা কোরায়শ সরদারগণ খেয়েছিলেন।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আমের একাকী মসজিদ থেকে ঘরে

ফিরছিলেন। পথে সকীফ গোত্রের একটি বালক তার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? বালকটি বলল ঃ না, কোন প্রয়োজন নেই। আপনি একা একা যাচ্ছিলেন, তাই সঙ্গ দিতে চলে এলাম, যাতে খোদা না করুন পথে কোন বিপদ দেখা দিলে তা নিজের উপর নিতে পারি। আব্দুল্লাহ্ তার হাত ধরে ফেললেন এবং ঘরে এনে তাকে এক হাজার দীনার দান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমার মুরব্বিরা তোমাকে চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন। যাও, এই দীনারগুলো তুমি নিজের জন্যে ব্যয় করো।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের নব্বই হাজার দেরহামের বিনিময়ে খালেদ ইবনে ওকবার বাড়ী কিনে নেন। বাড়ীটি বাজারে অবস্থিত ছিল। রাত হলে খালেদের বাড়ীর লোকজনদের কান্নার আওয়াজ আব্দুল্লাহর কানে ভেসে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কাঁদছে কেন? লোকেরা বলল ঃ বাড়ী বিক্রি হয়ে গেছে বলে কাঁদছে। তিনি খাদেমকে ডেকে বললেন ঃ তাদের কাছে গিয়ে বলে দাও— নব্বই হাজার দীনার এবং বাড়ী সব তোমাদের।

বর্ণিত আছে, খলীফা হারূন-অর-রশীদ হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাসের খেদমতে পাঁচশ' দীনার প্রেরণ করেন। এ সংবাদ শুনে লায়ছ ইবনে সা'দ ইমাম সাহেবের খেদমতে এক হাজার দীনার পাঠিয়ে দেন। এরপর খলীফা লায়ছকে ডেকে এনে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন যে, তুমি আমার প্রজা হয়ে কি কারণে আমার সাথে পাল্লা দিতে গেলে? লায়ছ আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমার কাছে প্রত্যহ এক হাজার দীনারের শস্য আসে। তাই এমন সম্মানিত ব্যক্তিকে একদিনের আমদানীর চেয়ে কম দিতে আমি লজ্জাবোধ করেছি। লায়ছ ইবনে সা'দের দানশীলতা সুবিদিত ছিল। এ কারণেই প্রত্যহ হাজার দীনার আমদানী সত্ত্বেও তার উপর যাকাত ওয়াজেব হয়নি। একবার জনৈকা মহিলা তাঁর কাছে সামান্য মধু চাইলে তিনি তাকে এক মশক মধু দিয়ে দেন। কেউ প্রশ্ন করল ঃ সামান্য মধু দিলেই তার প্রয়োজন মিটে যেত। আপনি এত বেশী দিলেন কেন? তিনি বললেন ঃ মহিলা তার প্রয়োজন মাফিক চেয়েছিল। আমি আমার প্রতি আল্লাহর দান মাফিক দিয়েছি।

আ'মাশ বর্ণনা করেন, আমার একটি ছাগল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। খায়ছামা ইবনে আবদুর রহমান প্রত্যহ তাকে দেখতে আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন— ছাগলটি ঘাস-পানি ঠিকমত খেয়েছে কি না? তোমার

ছেলেরা দুধ ছাড়া কিরূপে সবর করে। তুমি প্রত্যহ আমার বিছানার নীচে যা পাও, নিয়ে এসো। ফলে, ছাগলের অসুস্থতার দিনগুলোতে আমার কাছে তিন শ' দীনারেরও বেশী পৌঁছে গেল। আমার মনে এই আকাংখা জন্ম নিল যে, ছাগলটি অসুস্থই থাকুক।

খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান একদিন আসমা বিনতে খারেজাকে বললেন ঃ তোমার কয়েকটি সদ্গুণের খবর আমি পেয়েছি। সেগুলো আমার কাছে বর্ণনা কর। আসমা বললেন ঃ সেগুলো অন্যের মুখে শুনলেই আমার কাছ থেকে শুনার চেয়ে উত্তম হত। খলীফা কসম দিয়ে বললেন ঃ না, তুমিই বল। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমি কখনও আমার সাথে বসা ব্যক্তির সামনে পা ছড়াইনি। যখনই আমি খাদ্য তৈরী করে মানুষকে খাইয়েছি, তখনই তাদের উপর আমার যা অনুগ্রহ হয়েছে, তার চেয়ে বেশী আমি তাদের অনুগ্রহ নিজের উপর মনে করেছি। যখনই কোন ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চাইতে এসেছে, তখন আমি তাকে যা দিয়েছি, সেটাকে অনেক মনে করিনি।

দানবীর সা'দ ইবনে খালেদের নিয়ম ছিল, যদি দেয়ার মত তার কাছে কোন কিছু না থাকত, তবে প্রার্থীকে তমসুক অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিতেন এবং বলতেন ঃ আমি কোথাও থেকে কিছু পেলে তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ শোধ করে দেব। তিনি একবার সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের কাছে আগমন করলেন। খলীফা তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি প্রয়োজন? তিনি বললেন ঃ আমার যিম্মায় ঋণ হয়ে গেছে। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পরিমাণ? উত্তর হল ঃ ত্রিশ হাজার দীনার। খলীফা বললেন ঃ ত্রিশ হাজার ঋণের এবং এই পরিমাণই তোমার জন্যে দেয়া হবে।

আবু সাঈদ খরকুশী নিশাপুরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি মোহাম্মদ ইবনে হাফেয মোহাম্মদের কাছে শুনেছি— মিসরে এক ব্যক্তি ফকীরদের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে দিত। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তির সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সেই চাঁদা সংগ্রহকারীর কাছে গিয়ে বলল ঃ আমার ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু এখন আমার হাতে কিছুই নেই। এ কথা শুনতেই লোকটি তার সঙ্গে চলল এবং বহু লোকের কাছে গেল। কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছুই পেল না। এরপর সে এক ব্যক্তির কবরের উপর এসে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি বেঁচে থাকতে অনেক দান

করতে। আজ আমি অনেকের কাছে গেলাম এবং এই লোকটির জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এরপর নিজের কাছ থেকে একটি দীনার বের করল এবং সে টি ভাঙ্গিয়ে অর্ধেক লোকটির হাতে দিয়ে বলল ঃ আমি তোমাকে কর্জ দিলাম। যখন পার পরিশোধ করে দিয়ো। লোকটি অর্ধেক দীনার নিয়ে বাড়ী ফিরে এল এবং সন্তান হওয়ার কারণে যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তা পূরণ করে নিল। রাতের বেলায় সে মিসরীয় চাঁদা সংগ্রহকারী লোকটি স্বপ্নে দেখল, কবরস্থ লোকটি তাকে বলছে ঃ তুমি আমার কবরের উপর বসে যা বলেছিলে, আমি সব শুনেছি। কিন্তু তখন জওয়াব দেয়ার অনুমতি ছিল না বিধায় জওয়াব দিতে পারিনি। এখন শুন, তুমি আমার ঘরে গিয়ে আমার সন্তানদেরকে চুল্লীর নীচে খনন করতে বলবে। সেখান থেকে একটি পাত্রে পাঁচশ' দীনার বের হবে। সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে সেই লোককে দিয়ে দাও, যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সেমতে প্রত্যুষে সে সন্তানদের কাছে গেল এবং স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করল। তারা তাকে বসতে বলে চুল্লী খনন করল এবং পাঁচ শ' দীনার বের করে তার সামনে রেখে দিল। সে বলল ঃ এ ধন তোমাদের। আমার স্বপ্নের কি মূল্য! সন্তানরা বলল ঃ যার ধন, তিনি তো মৃত্যুর পরেও দান করেন। আমরা জীবিত অবস্থায় করব না কেন? মোটকথা, পরে লোকটি দীনার নিয়ে নিল এবং যার সন্তান হয়েছিল, তার কাছে এনে রাখল। সে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলল ঃ এখন এই ধন তোমার। যা ইচ্ছা, কর। সে একটি দীনার ভাঙ্গিয়ে নিল। অর্ধেক দিয়ে কর্জ শোধ করল এবং অর্ধেক নিজে রেখে বলল ঃ আমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকল দীনার তুমি ফকীরদের মধ্যে বন্টন করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জানি না, এই তিনজনের মধ্যে সর্বাধিক দাতা কাকে বলা উচিত?

বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁকে গোসল দেবে। ওফাতের পর সেই ব্যক্তিকে ওসিয়তের কথা জানানো হলে সে এসে তাঁর খরচের হিসাব বহি দেখল। জানা গেল, তাঁর যিম্মায় সত্তর হাজার দেরহাম কর্জ রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ সেই কর্জ নিজের নামে স্থানান্তর করে ইমাম সাহেবকে মুক্ত করে দিল। অতঃপর বলল ঃ আমার গোসল দেয়া দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য এটাই ছিল : অর্থাৎ, আমি যেন তাঁকে কর্জের কলুষতা থেকে পাক-পবিত্র করে দিই।

আবু সাঈদ বলেন ঃ আমি যখন মিসরে গেলাম, তখন এই ব্যক্তির বাড়ী তালাশ করলাম। লোকদের বর্ণনা অনুযায়ী তার বাড়ী গিয়ে তার পুত্র ও পৌত্রদের কয়েক জনকে পেলাম। সকলেরই মুখমন্ডলে কল্যাণ ও বরকতের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তাদের পিতার কল্যাণ ও বরকত তাদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মোহাম্মদ ইবনে ওব্বাদ মুহাল্লেবী রেওয়ায়েত করেন, আমার পিতা খলীফা মামুনের কাছে গেলে তিনি তাকে এক লাখ দেরহাম দেন। খলীফার কাছ থেকে চলে আসার পর তিনি সমুদয় অর্থ খয়রাত করে দেন। খবর পেয়ে খলীফা তাকে ডেকে শাসালেন। আমার পিতা জওয়াবে আরয করলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! উপস্থিত অর্থ দান না করলে মাবুদের প্রতি কুধারণা করা হয়। এতে খলীফা অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং আরও দু'লাখ দেরহাম দিয়ে দিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত তালহা (রাঃ)-এর যিম্মায় হযরত উসমান (রাঃ)-এর পঞ্চাশ হাজার দেরহাম প্রাপ্য ছিল। একদিন হযরত উসমান মসজিদে যাবার সময় হযরত তালহা এসে বললেন ঃ আপনার প্রাপ্য এখানে রয়েছে, নিয়ে নিন। তিনি বললেন ঃ আমি এই অর্থ আপনাকেই দিয়েদিলাম, যাতে আপনার আভিজাত্য রক্ষায় সহায়ক হয়।

সো'দা বিনতে আওফ বলেন ঃ আমি একদিন হযরত তালহার খেদমতে গিয়ে তাকে বিষণ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। ভাবছি, কি করা যায়। আমি বললাম ঃ ভাবনার কি আছে, আপনার সম্প্রদায়কে ডেকে বন্টন করে দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ গোলামকে পাঠিয়ে সবাইকে ডেকে আনলেন এবং সমুদয় অর্থ বিলিয়ে দিলেন। আমি গোলামকে অর্থের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ চার লাখ দেরহাম।

এক বেদুইন হযরত তালহার খেদমতে হাযির হয়ে কিছু চাইল এবং কিছু আত্মীয়তাও প্রকাশ করল। তিনি বললেন ঃ এ পর্যন্ত আত্মীয়তার কারণে কেউ আমার কাছে কিছু চায়নি। আমার এক খন্ড ভূমি আছে, যা উসমান তিন লাখ দেরহামে কিনতে চান। তুমি ইচ্ছা করলে সে জমিটি নিয়ে যাও। তা না হলে এর মূল্য তোমাকে দিয়ে দেব। বেদুইন ভূখন্ডের পরিবর্তে মূল্য নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সেমতে হযরত তালহা ভূখন্ডটি হযরত উসমানের কাছে বিক্রি করে মূল্য বেদুইনকে দিয়ে দিলেন।

বর্ণিত আছে, একদিন হযরত আলী (রাঃ)-কে কাঁদতে দেখে লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ সাতদিন ধরে আমার ঘরে কোন মেহমান আসেনি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন বলে আশংকা হয়।

এক ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল ঃ কি মনে করে? সে বলল ঃ আমার যিম্মায় চার শ' দেরহাম কর্জ রয়েছে। বন্ধু তৎক্ষণাৎ চার শ' দেরহাম গুণে তার হাতে তুলে দিল। অতঃপর সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী পৌছল। তার স্ত্রী বলল ঃ যদি এতগুলো দেরহাম দেয়া এতই কষ্টকর ছিল, তবে না দিলেই পারতে। সে বলল ঃ আমার কান্নার কারণ হল তার অবস্থা তার বলা ছাড়া আমি জানলাম না কেন? আমি যদি নিজেই খবর নিতাম, তবে তার চাওয়ার প্রয়োজন হত না।

কৃপণতার নিন্দা ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ, যাদেরকে মনের লোভ-লালসা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারাই সফলকাম।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্যে উত্তম; বরং এটা তাদের জন্যে অনিষ্টকর। সত্বরই কিয়ামতের দিন যে বস্তুতে তারা কৃপণতা করেছিল, তার বেড়ী তাদেরকে পরানো হবে।

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

অর্থাৎ, যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং তাদের প্রতি আল্লাহর কৃপাকে গোপন রাখে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّهُ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ يَسْفِكُوْا دِمَاءَهُمْ وَيَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

অর্থাৎ, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদেরকে তাদের রক্ত প্রবাহিত করতে উত্তেজিত করেছে এবং হারামসমূহকে হালাল করতে প্ররোচিত করেছে।

আরও বলা হয়েছে—

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ وَلَاخِبٌّ وَلَاخَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ

অর্থাৎ, কৃপণ, প্রতারক, খেয়ানতকারী ও চরিত্রহীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এভাবে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, তোমার কাছে আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে পৌঁছা থেকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী লেহইয়ানের দূতদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের সরদার কে? তারা বলল ঃ আমাদের সরদার জুদ ইবনে কায়স। কিন্তু সে কিছুটা কৃপণ। তিনি বললেন ঃ কৃপণতার চেয়ে বড় রোগ আর কি? সে তোমাদের সরদার নয়; বরং আমর ইবনে জামু। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ দাতা গোনাহগার আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃপণ আবেদ থেকে উত্তম।

এক হাদীসে আছে, কেউ কেউ বলে, কৃপণ যালেমের তুলনায় ক্ষমার্হ। অথচ আল্লাহর কাছে কৃপণতার চেয়ে বড় কোন যুলুম নেই। আল্লাহ পাক তাঁর ইয্যতের কসম খেয়ে বলেন ঃ না কৃপণ জান্নাতে যাবে, না "শাহীহ" অর্থাৎ, যে অপরকে দান করতে দেখে গাত্রদাহ অনুভব করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কা'বার তওয়াফ করার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি কা'বার গেলাফ জড়িয়ে ধরে বলছে— ইলাহী, এই ঘরের ইয্যতের খাতিরে আমার গোনাহ মাফ কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ কি, আমার কাছে বল। সে আরয করল ঃ আমার গোনাহ বর্ণনাতীত। তিনি বললেন ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না পৃথিবী তার সপ্ত স্তর সহ বেশী? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না পাহাড়-পর্বত বেশী? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গুনাহ বেশী, না সমুদ্র বেশী? লোকটি বলল ঃ আমার গোনাহ বেশী। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ তোমার গোনাহ বেশী, না সকল আকাশ? উত্তর হল ঃ আমার গোনাহ বেশী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার গোনাহ বড়, না আরশ বড়? সে বলল ঃ আমার গোনাহ বড়। প্রশ্ন হল ঃ তোমার গোনাহ বড়, না করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বড়? লোকটি বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা অনেক বড়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমার গোনাহ আমার কাছে বল। লোকটি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ধনী ব্যক্তি। কিন্তু যখন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চায়, তখন মনে হয় যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার সামনে রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। তোমার আগুনে আমাকে জ্বালিয়ো না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে হেদায়েত ও সত্যসহ পাঠিয়েছেন, যদি তুমি রোকন ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দশ লক্ষ বছর নামায পড়, অতঃপর তত বছর ক্রন্দনের ফলে তোমার অশ্রুতে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, বৃক্ষ সিক্ত হয়, এরপর কৃপণ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ পাক তোমাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। তোমার সর্বনাশ হোক- তুমি কি জান না যে, কৃপণতা কুফরের একটি অংশ এবং কুফর দোযখে যাবে? তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ — অর্থাৎ, যে দান করে না, সে নিজেকেই দান করে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা "জান্নাতে আদন" সৃষ্টি করে তাকে বললেন ঃ তুমি সজ্জিত হও। জান্নাত সজ্জিত হল। আবার বললেন ঃ তোমার নির্ঝরিণীসমূহ প্রকাশ কর। সে "সালসাবিল", "আইনে কাফুর" ও "আবে তাসনীম" নির্গত করল। এসবের দ্বারা শরাব, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত হতে লাগল। আল্লাহ আবার এরশাদ করলেন ঃ তোমার কুরসী, অলংকার, পোশাক ও আয়তলোচনা হূর প্রকাশ কর। জান্নাত এ আদেশও পালন করল। এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত পরিদর্শন করে এরশাদ করলেন ঃ কিছু বল। জান্নাত বলল ঃ যে আমার মধ্যে থাকবে, সে চমৎকার হবে। এরশাদ হল ঃ আমার ইযযতের কসম, কৃপণকে তোমার ভিতরে স্থান দেব না।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের বোন বলেন ঃ কৃপণকে ধিক! কৃপণতা যদি কোর্তা হত, আমি তা পরিধান করতাম না। যদি পথ হত, আমি তাতে চলতাম না।

একদিন অভিশপ্ত শয়তানের সাথে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়ার (আঃ) সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বল, মানুষের মধ্যে তোমার সর্বাধিক প্রিয় এবং অপ্রিয় কে? সে আরয করল ঃ অধিক প্রিয় কৃপণ মুমিন এবং অধিক অপ্রিয় গোনাহগার দাতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শয়তান বলল ঃ কেননা, কৃপণের জন্যে তার কৃপণতাই যথেষ্ট— আমার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে দাতা গোনাহ করে, তার ব্যাপারে আমার আশংকা থাকে, কোথাও দানশীলতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি না জানি কৃপা দৃষ্টি করেন! পরে সে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। এরপর শয়তান একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আপনি দাতা না হলে কখনও এসব কথা বলতাম না।

বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে আবু হাফসা কৃপণতাবশত গোশত খেত না। খুব মনে চাইলে সে গোলামকে একটি মস্তক কিনে আনতে বলত এবং তাই খেয়ে নিত। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ ব্যাপার কি, তুমি শীতে ও গ্রীষ্মে সব সময় মস্তক খাও! সে বলল ঃ কারণ, মস্তকের মূল্য আমার জানা আছে। এতে গোলাম চুরি করতে পারবে না এবং আমাকে লোকসান দিতে হবে না। এছাড়া গোশত হলে সে রান্না করার সময় কিছু খেয়ে নিতে পারে। মস্তকে এটাও সম্ভবপর নয়। যদি সে মস্তকের চোখ, কান অথবা গালে হস্তক্ষেপ করে, তবে আমি জানতে পারব। এগুলো ছাড়া মস্তকে আমি কয়েক প্রকারের স্বাদ পাই। চোখের স্বাদ ভিন্ন, কান ও জিহবার স্বাদ আলাদা এবং মগজের স্বাদ পৃথক। মস্তক রান্না করাও কঠিন নয়। এখন বুঝতেই পারছ এতে লাভ কত বেশী! এই মারওয়ানই একদিন খলীফার দরবারে যাচ্ছিল। তার বাড়ীর এক মহিলা বলল ঃ যদি তুমি পুরস্কার পাও, তবে আমাকে কি দেবে? সে বলল ঃ যদি এক লাখ দেরহাম পাই, তবে এক দেরহাম তোমাকে দেব। ঘটনাক্রমে সে খলীফার কাছ থেকে ষাট হাজার দেরহাম লাভ করল। সেমতে এই হিসাব অনুযায়ী সে মহিলাকে এক দেরহামের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ দিয়ে দিল। একবার সে এক দেরহামের গোশত কিনলে এক ব্যক্তি দাওয়াতের আবদার করল। সে তৎক্ষণাৎ গোশত কসাইয়ের হাতে ফেরত দিয়ে দেরহামের এক-চতুর্থাংশ কম গ্রহণ করে বলে ঃ আমার অপব্যয় করতে খারাপ লাগে।

হযরত আ'মাশ (রহঃ)-এর জনৈক পড়শী যারপরনাই কৃপণ ছিল। সে বরাবরই তাঁকে বলত ঃ আমার বাড়ী গিয়ে আপনি এক খন্ড রুটি নিমক দিয়ে খেলে কৃতার্থ হতাম। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করতেন। একদিন পড়শী অভ্যাস অনুযায়ী একথা আরয করল। তখন তাঁর ক্ষুধাও ছিল। তাই বললেন ঃ আচ্ছা চল। পড়শী তাঁকে বাড়ী এনে সত্যি সত্যিই এক খন্ড রুটি ও নিমক সামনে রেখে দিল। এমন সময় ভিক্ষুক এসে হাঁক দিলে পড়শী তাকে বলল ঃ মাফ কর। ভিক্ষুক দ্বিতীয়বার সওয়াল করলে সে পূর্ববৎ 'মাফ কর' বলল। কিন্তু তৃতীয়বার সওয়াল করতেই সে রেগে-মেগে বলল ঃ চলে যাও। নতুবা লাঠি নিয়ে আসছি। হযরত আ'মাশ ভিক্ষুককে ডেকে বললেন ঃ শাহজী, চলে যাও। এই গৃহকর্তা ওয়াদায় বড় পাক্কা। আল্লাহর কসম, আমি তার মত সাচ্চা লোক দেখিনি। বহুদিন ধরে আমাকে রুটির টুকরা নিমকসহ খেতে বলে আসছিল। আজ এ দুটি বস্তুর বেশী সে আমার সমনে রাখেনি।

আত্মত্যাগ ও তার ফযীলত ঃ প্রকাশ থাকে যে, দানশীলতা ও কৃপণতার অনেক স্তর রয়েছে। দানশীলতার স্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আত্মত্যাগ; অর্থাৎ, নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও অপরকে দান করা। দানশীলতা হচ্ছে নিজের যে জিনিসের প্রয়োজন নেই, তা অভাবগ্রস্তকে অথবা অভাবগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তিকে দান করা। নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও

অপরকে দান করা অত্যন্ত কঠিন। দানশীলতা যেমন উন্নীত হয়ে কখনও এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, মানুষ অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজের সম্পদ অপরকে দিয়ে দেয়, তেমনি কৃপণতাও কখনও এত নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায় যে, মানুষ নিজের অর্থ প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজের জন্যে ব্যয় করে না। উদাহরণতঃ কোন কোন কৃপণ অর্থ-সম্পদকে এমনভাবে আগলে রাখে যে, নিজে অসুস্থ হলে চিকিৎসা পর্যন্ত করে না এবং মনে কোন কিছু খাওয়ার অদম্য বাসনা থাকলে তা কিনে খায় না— বিনা পয়সায় পেলে খেয়ে নেয়। এরূপ ব্যক্তি প্রয়োজন সত্ত্বেও নিজের সাথে কৃপণতা করে। অপরপক্ষে আত্মত্যাগী ব্যক্তি নিজের অভাবের উপর অপরের অভাবকে অগ্রাধিকার দেয়। অতএব, এ দু'ব্যক্তির মধ্যে কত তফাৎ!

সচ্চরিত্র আল্লাহ তা'আলার একটি নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। দানশীলতার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের উপর কোন স্তর নেই। কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা এই আত্মত্যাগের কারণেই করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة

অর্থাৎ, তারা ক্ষুধার্ত হলে কি হবে, তারা অপরকে নিজেদের চেয়ে অধিক হকদার মনে করে।

হাদীস শরীফে আছে—

ايما امرؤ اشتهى فرد شهوته واثر على نفسه غفرله -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির কোন খায়েশ হয়, অতঃপর সে তা থেকে বিরত থাকে এবং নিজেকে বাদ দিয়ে অপরকে দেয়া পছন্দ করে, তার মাগফেরাত হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) কখনও তিনদিন উপর্যুপরি পেটভরে আহার করেননি। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া পর্যন্ত এমনি অবস্থা অব্যাহত ছিল। আমরা ইচ্ছা করলে পেটভরে খেতে পারতাম। কিন্তু মোহাজিরগণকে পেটভরে খাওয়ানো আমাদের কাছে অগ্রগণ্য ছিল।

একবার আমাদের বাড়ীতে এক অতিথি আগমন করল। ঘরে তখন

কিছুই ছিল না। এমন সময় জনৈক আনসারী সেখানে এল এবং অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে গেল। বাড়ী পৌঁছে অতিথির সামনে সে খাবার রেখে দিল এবং স্ত্রীকে বাতি নিভিয়ে দিতে বলল। সে অন্ধকারে নিজের হাতও খানার দিকে বাড়াতে লাগল, যেন অতিথির সাথে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সে খাচ্ছিল না। অবশেষে অতিথি সম্পূর্ণ খাদ্য খেয়ে নিল। প্রত্যুষে রসূলে আকরাম (সাঃ) আনসারীকে বললেন ঃ তুমি রাতে মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করলে তা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة

অর্থাৎ, তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত হলেও অপরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

মোটকথা, দানশীলতা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম চরিত্র। এর সর্বোচ্চ স্তরের নাম আত্মত্যাগ। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিত্য দিনের অভ্যাস ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই চরিত্রকে মহান চরিত্র আখ্যায়িত করেছেন— انك لعلى خلق عظيم অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

সোহায়ল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) দোয়া করলেন, ইয়া ইলাহী! আমাকে মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের কিছু মর্তবা দেখিয়ে দিন। এরশাদ হল ঃ হে মূসা, তুমি সহ্য করতে পারবে না। তবে একটি মহান মর্তবা দেখিয়ে দিচ্ছি, যার কারণে আমি তাকে তোমার উপর ও সমগ্র সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এরপর একবারই ঊর্ধ্বজগতের আবরণ সরিয়ে নেয়া হল। হযরত মূসা (আঃ) যখন তাদের একটি মর্তবা দেখলেন, তখন নূরের বিকিরণ ও আল্লাহর নৈকট্যের প্রভাবে যেন তার প্রাণ নির্গত হওয়াই অবশিষ্ট ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! কোন্ বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদেরকে এই মাহাত্ম্য দান করা হল? এরশাদ হল ঃ একটি অভ্যাসের কারণে, যা আমি তাদের মধ্যে রেখেছি এবং অন্যকে দেইনি। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের কারণে তারা এই মর্তবা লাভ

করেছে। হে মূসা, যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন এই আত্মত্যাগ অবলম্বন করে এবং আমার কাছে আসে, তখন তার হিসাব নিতে আমি লজ্জাবোধ করব। সুতরাং তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতের যেখানে চাইবে, সেখানে জায়গা দেব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর নিজের কিছু জমি দেখার জন্যে বের হন। পথে এক বাগানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। বাগানে এক হাবশী গোলাম কাজ করছিল। যখন তার খাদ্য এল, ঠিক তখনি একটি কুকুর বাগানে ঢুকে গোলামের কাছে এল। গোলাম কুকুরটিকে একটি রুটি দিয়ে দিল। এটি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় রুটিটিও দিয়ে দিল। এরপর তৃতীয়টি দিয়ে দিল। এভাবে দিতে দিতে সে সবগুলো রুটিই কুকুরকে খাইয়ে দিল। হযরত আব্দুল্লাহ বসে বসে দেখছিলেন। অতঃপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ প্রতিদিন তোমার খাদ্য কতটুকু আসে? গোলাম আরয করল ঃ ততটুকুই , যতটুকু আপনি দেখেছেন। তিনি বললেন ঃ তাহলে সবটুকু খাদ্য কুকুরকে খাইয়ে দিলে কেন? নিজে খেলে না কেন? গোলাম আরয করল ঃ এখানে কোন কুকুর থাকে না। মনে হয় এ কুকুরটি মুসাফির। দূর থেকে এসেছিল এবং ক্ষুধার্ত ছিল। আমার কাছে তার ক্ষুধার্ত থাকা এবং নিজের পেটভরে খাওয়া ভাল মনে হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন সারাদিন কি খাবে? সে বলল ঃ উপবাস করব। হযরত আব্দুল্লাহ ভাবলেন, আমি তাকে দানশীলতার জন্যে তিরস্কার করছি। সে তো আমার চেয়েও অধিক দাতা। এরপর তিনি সেই বাগান, গোলাম এবং সেখানকার সমস্ত আসবাবপত্র কিনে নিয়ে গোলামকে মুক্ত করে দিলেন এবং বাগানটি তাকে দিয়ে দিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ কোন এক সাহাবীর কাছে কেউ একটি মস্তক হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিল। তিনি ধারণা করলেন, আমার তুলনায় অমুক ভাই এই মস্তকের অধিক মুখাপেক্ষী। সেমতে তিনি মস্তকটি তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তৃতীয় একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মস্তকটি সাত বাড়ী ঘুরে অবশেষে আসল মালিক অর্থাৎ, প্রথম ব্যক্তির হাতে পৌঁছে গেল। সোবহানাল্লাহ, কি অপূর্ব আত্মত্যাগ!

বর্ণিত আছে, যে রাত্রিতে হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিছানায় শুয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত

করেছিলেন, সে রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈলকে বললেন ঃ আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি এবং একজনের বয়স অপরজনের চেয়ে বেশী করেছি। এখন বল, তোমাদের মধ্যে কে কম জীবন চায় এবং অপরের জন্য অধিক জীবন পছন্দ করে? কিন্তু উভয়েই নিজের জীবন বেশী হওয়াই কামনা করলেন। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের বিষয়টি কেউ পছন্দ করলেন না। এরশাদ হল ঃ তোমরা উভয়েই কি হযরত আলীর মত হতে পারলে না? আমি তার ও আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি। আজ রাতে আলী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিছানায় তাঁর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং তার জীবিত থাকাকে নিজের জীবিত থাকার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। এখন তোমরা পৃথিবীতে যাও এবং শত্রুদের কবল থেকে আলীকে হেফাযত কর। অতঃপর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত জিবরাঈল তাঁর শিয়রে এবং মীকাঈল পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ বাহ্ বাহ্ হে আবু তালেব-তনয়, আজ তোমার মত কেউ নয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করেন। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ -

অর্থাৎ, এমন লোক আছে, যে নিজেকে বিক্রি করে ফেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

হুযায়ফা আদভী বলেন ঃ আমি এয়ারমুক যুদ্ধের সময় সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলাম। আমি আমার চাচাত ভাইকে খোঁজ করছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল যদি তার মধ্যে কিছু নিঃশ্বাস বাকী থাকে, তবে পানি পান করিয়ে দেব। তাই সামান্য পানি সঙ্গে নিয়ে গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে তালাশ করার পর তাকে জীবিত পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ পানি দেব? সে ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করল। যখন আমি পানি পান করাতে চাইলাম, তখন কাছ থেকে একজনের "আহ" শব্দ শুনতে পেলাম। আমার চাচাত ভাই ইশারা করল যে, প্রথমে তাকে পান করাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, হেশাম ইবনে আসা কাতরাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ পানি

দেব? ঠিক সেই মুহূর্তে অপর একজনের "আহ" শব্দ কানে ভেসে এল। হেশাম ইশারা করল প্রথমে সেখানে নিয়ে যাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখি লোকটি মারা গেছে। আমি সেখান থেকে আবার হেশামের কাছে এলাম। তখন সে-ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। এরপর আমি আমার চাচাত ভাইয়ের কাছে এসে তাকেও জীবিত পেলাম না। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।

আব্বাস ইবনে দাহকান বলেন ঃ বিশর ইবনে হারেছ ছাড়া এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে দুনিয়াতে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই বিদায় নিয়েছে। বিশর ইবনে হারেছ অবশ্য যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। তার অন্তিম শয্যায় এক ব্যক্তি এসে কিছু সওয়াল করলে তিনি নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দেন। এরপর তিনি অন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কাপড় চেয়ে নেন এবং তাতেই ইন্তেকাল করেন।

দানশীলতা ও কৃপণতার স্বরূপ ঃ শরীয়তসম্মত দলীলসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত ও স্বীকৃত যে, কৃপণতা বিনাশকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। কিন্তু মানুষ কিসে কৃপণ গণ্য হয় এবং কৃপণতা কাকে বলে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। কেননা, প্রত্যেক মানুষ আপন অভিমত অনুযায়ী নিজেকে দাতা মনে করে, অথচ অপরের দৃষ্টিতে সে হয় কৃপণ। অথবা এক ব্যক্তি কোন কাজ করলে তাতে মানুষের মত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ বলে এটা কৃপণতা, আবার কেউ সিদ্ধান্ত দেয় এটা কৃপণতা নয়। এছাড়া কোন মানুষের মন ধন-সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত নয়। এই মোহের কারণে সে ধন-সম্পদের হেফাযত করে এবং তা আটকে রাখে। যদি আটকে রাখার কারণেই কেউ কৃপণ হয়ে যায়, তবে এ থেকে কেউ মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যদি আটকে রাখার কারণে কৃপণ না হয়, তবে কৃপণতার অর্থ কি, তা বুঝা দরকার। কৃপণতা তো আটকে রাখারই নাম। এর কোন্‌টি বিনাশকারী? যে দানশীলতার কারণে মানুষ দাতা কথিত হয় এবং সওয়াব পায়, তার সংজ্ঞা কি?

এসব প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন ঃ ওয়াজিব হক আদায় না করাকে বলা হয় কৃপণতা। এদিক দিয়ে যে ব্যক্তি তার যিম্মায় যেসব ওয়াজিব রয়েছে, সেগুলো দিতে থাকে, সে কৃপণ নয়। কিন্তু এই সংজ্ঞা যথেষ্ট নয়। কেননা, যে ব্যক্তি কসাইয়ের কাছ থেকে গোশত কিনে মেহমানের ভয়ে তা কিছু কম দামে ফিরিয়ে দেয়, সে সবার মতেই কৃপণ। অনুরূপভাবে যে তার পরিবারবর্গকে নির্ধারিত হারে খোরপোশ দেয়, যদি কেউ এক লোকমাও বেশী চায় অথবা তার ধন থেকে সামান্য বস্তু খেয়ে নেয়, তবে তা দিতে অস্বীকার করে, সে-ও কৃপণ বলেই গণ্য হয়। এমনিভাবে যদি কেউ রুটি খায় এবং অন্য কেউ সেখানে আসার পর রুটিতে শরীক হয়ে যাবে মনে করে রুটি লুকিয়ে রাখে, সে কৃপণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথচ এই তিনটি সিদ্ধান্তের কেউ এমন নয় যে, সে ওয়াজিব হক আদায় করেনি।

কেউ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দান করাকে কঠিন মনে করে, সে-ই কৃপণ। এ সংজ্ঞাটিও অসম্পূর্ণ। কেননা, এর উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সকল প্রকার দান তার কাছে কঠিন, তবে অনেক কৃপণ এমন রয়েছে যারা অল্প দান করাকে কঠিন মনে করে না। এক-দুই পয়সা দিয়ে দেয়। বেশী পরিমাণে দেয়া অবশ্য তাদের জন্যে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, কতক দান কঠিন হয়, তবে এটা দাতার মধ্যেও বিদ্যমান আছে। উদাহরণতঃ সমস্ত ধন অথবা অধিকাংশ ধন দান করা কঠিন মনে হয়; কিন্তু এতে কেউ কৃপণ বলে কথিত হয় না।

কারও মতে বিনা দ্বিধায় অপরের অভাব পূরণ করার নাম দানশীলতা। কেউ বলেন ঃ সওয়ালকারীকে দেখে খুশী হওয়া এবং দেয়ার কারণে উল্লসিত হওয়ার নাম দানশীলতা। কিছু লোক বলেন ঃ দানশীলতা হচ্ছে চাওয়া ছাড়া কাউকে কিছু দেয়া এবং যা দেয়া হয়, তাকে অল্প জ্ঞান করা। কেউ বলেন ঃ এরূপ ধারণা করে ধন দেয়া যে, ধনও আল্লাহর এবং বান্দাও তাঁরই। কাজেই আল্লাহর ধন আল্লাহর বান্দাকে দেয়া হচ্ছে। এতে দারিদ্র্য ও উপবাসের ভয় কিসের? এরূপ মনে করে দান করার নাম দানশীলতা। কারও অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি কিছু অর্থ দান করে দেয় এবং কিছু নিজের জন্যে রেখে দেয়, সে দানশীল। আর যে নিজে কষ্ট করে এবং অপরের আশা পূরণ করে, সে আত্মত্যাগী। পক্ষান্তরে যে কিছুই দান করে না, সে কৃপণ।

কৃপণতা ও দানশীলতা সম্পর্কে বর্ণিত এতগুলো উক্তি দ্বারা এ দুটি বিষয়ের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় না। তাই আমরা বিষয়টি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করছি।

মূলকথা, ধন-সম্পদ একটি রহস্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে সৃজিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনাদিকে সঠিক পথে রাখার জন্যে ধন-সম্পদের সৃষ্টি

হয়েছে। এখন ধন-সম্পদ যেখানে ব্যয় করা উচিত, সেখানে ব্যয় করতে বিরত থাকা কিংবা যেখানে ব্যয় করা উচিত নয়, সেখানে ব্যয় করা উভয়টিই সম্ভব। এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এটাও সম্ভবপর যে, যেখানে ব্যয় না করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা এবং যেখানে ব্যয় করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা। সুতরাং জরুরী জায়গায় ব্যয় না করে ধন আটকে রাখা কৃপণতা এবং যেখানে আটকে রাখা জরুরী, সেখানে ব্যয় করা অপব্যয়। এতদুভয়ের মাঝখানে ব্যয় করা এবং আটকে রাখা ভাল। এই মধ্যবর্তী স্তরের নাম দানশীলতা হওয়া উচিত। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেবল দান করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরপর এরশাদ হলঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

অর্থাৎ, আপন হাতকে গ্রীবার সাথে বাঁধা রাখবে না এবং তাকে পুরাপুরি প্রসারিতও করবে না।

আরও এরশাদ হল ঃ

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا -

অর্থাৎ, আর তারা, যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং সংকীর্ণতা প্রদর্শন করে না। এর মধ্যস্থলে রয়েছে একটি সরল ব্যয় পদ্ধতি।

এ থেকে জানা গেল যে, ব্যয় করা ও আটকে রাখাকে ওয়াজিব ও জরুরী পরিমাণের মধ্যে সীমিত করা দানশীলতা। কিন্তু এর সাথে এ শর্তটিও জুড়ে দিতে হবে যে, এ কাজটি শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত অন্তরও এতে সন্তুষ্ট না থাকে এবং বিরোধ না করে। সুতরাং যদি উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করে; কিন্তু মন তাতে বিরোধ করে এবং সে বিরোধের মুখে সবর করে, তবে এরূপ ব্যক্তিকে দানশীল বলা হবে না; বরং দানশীল হওয়ার চেষ্টাকারী বলা হবে। এ বিষয়টি কোন্ ব্যয় ওয়াজিব, তা চিনার উপর নির্ভরশীল। জানা উচিত যে, ওয়াজিব ব্যয় দু'রকম। এক, যা শরীয়তের নির্দেশে ওয়াজিব। যেমন, যাকাত দেয়ার জন্যে ব্যয় করা। দুই, যা আভিজাত্য ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করে জরুরী।

অতএব দানশীল সেই হবে, যে তার ধন-সম্পদকে না শরীয়তের ওয়াজিব থেকে আটকে রাখে এবং না অভ্যাস ও ভদ্রতার জরুরী বিষয়াদি থেকে আটকে রাখে। যদি এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন একটিতে ত্রুটি করে, তবে সে হবে কৃপণ। কিন্তু যে শরীয়তের ওয়াজিব আদায় করবে না, সে হবে অধিক কৃপণ। উদাহরণতঃ কেউ ধন-সম্পদের যাকাত দেয় না অথবা নিজের পরিবারের প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ আদায় করে না, তাকে কৃপণ মনে করতে হবে। কিংবা ধন দেয়ার সময় কেউ বেছে বেছে খারাপটি দেয়। এটাও কৃপণতাই। ভদ্রতার কারণে যে ব্যয় জরুরী, তা হল সামান্য সামান্য বিষয়ে সংকোচন নীতি অবলম্বন করা। এটি অত্যন্ত খারাপ কথা। এটা অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কতক বিষয়ে ধনী ব্যক্তির সংকোচন নীতি খারাপ মনে হয়, ফকীরের নয়। কিংবা পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের সাথে সংকোচন নীতি অবলম্বন করা খারাপ মনে হয়— বেগানাদের সাথে খারাপ মনে হয় না। পড়শীর সাথে সংকোচন নীতি দূরবর্তীদের তুলনায় খারাপ মনে হয়। তদ্রূপ অতিথি সেবায় সংকোচন নীতি ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য কাজ-কারবারের তুলনায় খারাপ মনে হয়।

অতএব কৃপণ তাকে বলা হয়, যে ধনকে এমন জায়গায় ব্যয় করা থেকে আটকে রাখে, যেখানে শরীয়তের নির্দেশে অথবা ভদ্রতার দাবীর কারণে আটকে রাখা উচিত নয়।

সারকথা, যে ব্যক্তি শরীয়তের ওয়াজিব ও ভদ্রতার ওয়াজিব আদায় করে, সে কৃপণতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তবে দানশীলতার গুণে তখন গুণান্বিত হবে, যখন এই পরিমাণের চেয়ে বেশী ব্যয় করবে। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্তবা এতেই পাওয়া যায়। সুতরাং যে স্থানে শরীয়তের দৃষ্টিতে ধন ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, সেখানে যার মনে ব্যয় করার যে পরিমাণ অবকাশ থাকবে, সে সেই পরিমাণে দাতা হবে। বলা বাহুল্য, এর স্তর অসংখ্য হতে পারে। এ কারণেই অনেকে অনেকের চেয়ে অধিক দাতা হয়ে থাকে। তবে দাতা হওয়ার জন্য শর্ত হল, মনের খুশীতে দান করা। খেদমত পাওয়ার আশায় অথবা প্রতিদান, শোকর ও প্রশংসা লাভের আকাংখায় যারা দান করে, সে দাতা নয়; বরং সে ধন দিয়ে প্রশংসা ক্রয় করে নেয়। সুতরাং তাকে সওদাগর ও ব্যবসায়ী বলা উচিত। কারণ, নিঃস্বার্থ ব্যয়কেই দান বলা হয়। বাস্তবে এ ধরনের দান আল্লাহ পাকের সত্তা ছাড়া অন্য কারও

জন্যে সম্ভব নয়। তবে মানুষকে দাতা বলা হয় রূপক অর্থে। কারণ, তার কোন ব্যয় স্বার্থমুক্ত হয় না। কিন্তু সে স্বার্থ যদি কেবল আখেরাতের সওয়াব এবং কৃপণতার কলুষতা থেকে নিজেকে পবিত্র করা হয়, তবেই তাকে দানশীল বলা হবে।

কৃপণতার প্রতিকার কেমন করে সম্ভব ঃ পূর্বেই জানা গেছে, কৃপণতার কারণ হচ্ছে ধন-সম্পদের মহব্বত। এখন জানা দরকার যে, ধন-সম্পদের মহব্বতের কারণ দুটি। প্রথম কারণ খাহেশপ্রীতি। ধন-সম্পদ ছাড়া এটা অর্জিত হতে পারে না। এতে অনেক দিন বেঁচে থাকার আশাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মানুষ যদি জানতে পারে, সে আগামীকাল মারা যাবে, তবে ধন-সম্পদের কৃপণতা না করার সম্ভাবনাই বেশী। যে পরিমাণ ধন মানুষের একদিন, একমাস অথবা এক বছরের জন্যে যথেষ্ট, তা স্বল্প পরিমাণই বটে। এর বেশী ধন রাখা অনর্থক। মাঝে মাঝে বেশী আশা এভাবে হয় যে, নিজের জীবনের আশা তো বেশী হয় না, কিন্তু সন্তানদের রিযিকের চিন্তা যত বেশী করে, ততই কৃপণতাও শক্তিশালী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ স্বয়ং ধন-সম্পদই ভাল মনে হওয়া। উদাহরণতঃ কোন কোন লোকের কাছে এত বেশী ধন-সম্পদ থাকে যে, নিজের নিয়মানুযায়ী ব্যয় করলে সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট হয় এবং হাজারো বেঁচে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান হয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও যাকাত দিতে মন চায় না। নিজে অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসায়ও ব্যয় করা ভাল মনে করে না। কেননা, সে টাকা-পয়সার প্রেমিক। টাকা-পয়সা হাতে থাকাটা তার কাছে অত্যন্ত প্রশস্তিকর বিবেচিত হয়। তাই একে মাটিতে পুঁতে রাখে। অথচ জানে, মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে কিংবা শত্রুর হস্তগত হবে। অন্তরের এ রোগটির প্রতিকার খুব কঠিন। বিশেষত বার্ধক্যে তো এটা দুরারোগ্যই বটে। এ রোগীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ কারও প্রেমে পড়ে এবং তার সাথে তার দূতকেও ভালবাসতে থাকে। এরপর দূতের মহব্বতে এমন মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আসল প্রেমাস্পদকে ভুলে যায়। টাকা-পয়সাও অভাব-অনটনের দূত। এর কারণে অভাব-অনটন হাসিল হয়। তাই টাকা-পয়সা প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে অভাব-অনটনের প্রতি লক্ষ্যও থাকে না; কেবল টাকা-পয়সাকেই প্রিয় মনে করা হয়।

অতএব, খাহেশপ্রীতির চিকিৎসা হল, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা এবং সবর করা। আর দীর্ঘ আশার প্রতিকার হচ্ছে হরদম মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং সমসাময়িকদের মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করা যে, তারা কেমন দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে এবং বিপদাপদ সহ্য করে অর্থকড়ি সঞ্চয় করেছে, কিন্তু শেষে খালি হাতে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। যদি সন্তান-সন্ততির ভাবনা অন্তরে থাকে, তবে চিন্তা করবে, যে সৃষ্টিকর্তা ছেলে দিয়েছেন, তিনি তার রিযিকও দিয়েছেন। অনেক সন্তানের কাছে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা পিতা-মাতার কাছ থেকে সম্পত্তিপ্রাপ্ত সন্তানদের চেয়ে অনেক বেশী সচ্ছল হয়ে থাকে। আর এটাও জানার কথা যে, সন্তানদের জন্যে অর্থ সঞ্চয়ের পিছনে নিয়ত এটাই থাকে যে, তাদের অবস্থা ভাল থাকুক। কিন্তু কখনও এর বিপরীত অবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সন্তান যদি সৎকর্মপরায়ণ হয়, তবে তার জন্যে আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট। আর যদি পাপাচারী হয়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি যা পাবে, তা গোনাহের কাজে উড়িয়ে দেবে এবং এর শাস্তি পিতাকেও ভোগ করতে হবে।

কৃপণতার এক প্রতিকার এটাও যে, কৃপণতার নিন্দায় ও দানশীলতার প্রশংসায় যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা কৃপণের জন্যে যেসব শাস্তি ও কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আরও একটি উপকারী চিকিৎসা এই যে, কৃপণদের অবস্থা চিন্তা করবে এবং তাদেরকে ঘৃণা করবে। এমন কোন কৃপণ নেই, যে অপরের কৃপণতাকে খারাপ মনে না করে। সুতরাং চিন্তা করবে যে, যদি আমি কৃপণতা করি, তবে অপরের দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যাব; যেমন আমার কাছে অন্য কৃপণ হেয় ও নিকৃষ্ট।

আরও একটি তদবীর এই যে, ধন-সম্পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, এটা সৃষ্টি করার কারণ কি? যখন জানা যাবে, ধন-সম্পদ কেবল অভাব-অনটন পূরণের জন্যে সৃজিত হয়েছে, তখন যতটুকু অভাব পূরণে যথেষ্ট, সে পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ আখেরাতের জন্যে সঞ্চয় করবে, অর্থাৎ, ব্যয় করে সওয়াবের ভাণ্ডার গড়ে তুলবে। এ পর্যন্ত বর্ণিত সবগুলো প্রতিকার এলম তথা জ্ঞানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ বুদ্ধির জোরে যখন জানবে যে, ব্যয় করা আটকে রাখার তুলনায় দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গলজনক, তখন সে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহিত হবে। কিন্তু

এটা অপরিহার্য যে, ব্যয় করার কল্পনা অন্তরে আসার সাথে সাথে অবিলম্বে তা বাস্তবায়িত করবে— টালবাহানা করবে না। কেননা, শয়তান সর্বক্ষণ দারিদ্র্যের ভয় দেখাতে থাকে এবং ব্যয় করতে বাধা দেয়। বর্ণিত আছে, আবুল হাসান পুশঙ্গী (রহঃ) একদিন পায়খানায় বসা ছিলেন, এমন সময় এক শিষ্যকে ডেকে বললেন ঃ আমার জামাটি শরীর থেকে খুলে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। শাগরেদ আরয করল ঃ আপনি পায়খানা থেকে বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতে পারলেন না? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে জামা দিয়ে দেয়ার কথা মনে পড়েছে। আমি নফ্সের তরফ থেকে আশংকা করি যে, সে এই কল্পনা বদলে দেবে। তাই অবিলম্বে কল্পনাটি বাস্তবায়িত করছি।

কৃপণতার স্বভাবটি তখনই দূরীভূত হয়, যখন মনের উপর জোর দিয়ে ব্যয় করার অভ্যাস করা হয়। যেমন, প্রেমাস্পদ সামনে থাকা পর্যন্ত প্রেম দূরীভূত হয় না। হাঁ, যদি প্রেমাস্পদ থেকে বিছিন্ন হওয়া যায় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনের উপর জোর দিয়ে বিরহে সবর করা হয়, তবে ক্রমান্বয়ে অন্তর স্থির ও শান্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কৃপণতার চিকিৎসা করতে চায়, তার উচিত, ধন-সম্পদ থেকে মনের উপর জোর দিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলা। বলা বাহুল্য, আদর করে রেখে দেয়ার চেয়ে সমুদয় ধন-সম্পদ পানিতে ফেলে দেয়া উত্তম।

কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি সূক্ষ্ম কৌশল রয়েছে। তা হল নফ্সকে এই বলে ধোকা দেয়া যে, লেনদেন করলে তোর সুখ্যাতি হবে এবং দাতা বলে খ্যাত হবে। এভাবে রিয়া তথা লোক-দেখানোর ইচ্ছায় ব্যয় করবে। এতে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কৃপণতা দূর করে রিয়ার মধ্যে লিপ্ত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে রিয়া দূর করে নিতে হবে। মোটকথা, ধন-সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার পর নাম ও সুখ্যাতি মানুষের সান্ত্বনার বিষয়। উদাহরণতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ ছাড়ানোর সময় পাখী ইত্যাদির সাথে খেলা লাগিয়ে দেয়া হয়, যাতে দুধের কথা মনে না করে। এটা উদ্দেশ্য থাকে না যে, সারা জীবনই পাখী নিয়ে খেলা করবে। বরং যখন দুধের কথা ভুলে যায়, তখন এ খেলা থেকেও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়। কিন্তু এই চিকিৎসা এমন ব্যক্তির জন্যই উপকারী, যার মধ্যে রিয়ার তুলনায় কৃপণতা প্রবল। এমতাবস্থায় যেন শক্তিশালী গুণটিকে দুর্বল

গুণ দ্বারা বদলে দেয়া হবে। কিন্তু যদি রিয়া ও কৃপণতা উভয়টি সমান হয়, তবে এ চিকিৎসায় তার কোন উপকার হবে না। এর পরীক্ষা এই যে, যদি লোক-দেখানো ভাবে ব্যয় করা তার জন্যে কঠিন মনে না হয়, তবে রিয়া গুণটি প্রবল বলে জানতে হবে। আর যদি লোক-দেখানো ভাবেও ব্যয় করা তার কাছে কঠিন মনে হয়, তবে কৃপণতা প্রবল বলে জানতে হবে।

রিয়া, কৃপণতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবগুলো যে একটি অপরটির দ্বারা দূর হয়ে যায়, এর দৃষ্টান্ত এরূপ বুঝা উচিত যে, কবরে মৃতের সমস্ত অংশ কৃমি তথা কীট হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ এটাই যে, এসব কীট একে অপরকে খেয়ে বড় হয় এবং সংখ্যা হ্রাস পায়। অবশেষে এদের মধ্যে দু'টি শক্তিশালী কীট থেকে যায়। এরপর এরাও পরস্পর লড়াই করতে থাকে এবং পরিশেষে একটি প্রবল হয়ে অপরটিকে হজম করে ফেলে। এরপর নিজেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। এমনিভাবে মন্দ স্বভাবগুলোর মধ্যেও এটা সম্ভব যে, সবল স্বভাবটি দুর্বল স্বভাবকে খেয়ে ফেলবে এবং অবশেষে একটিই থেকে যাবে। এই একটিকে খতম করার উপায় হচ্ছে তার খোরাক বন্ধ করে দেয়া। মন্দ-স্বভাবের খোরাক বন্ধ করার অর্থ সেই স্বভাবের দাবী অনুযায়ী কাজ না করা। অর্থাৎ, কোন মন্দ স্বভাব যেসব কাজ করতে চায়, তা কখনও না করা। এভাবে তার খোরাক বন্ধ করে দিলে সেই স্বভাবটি দুর্বল হয়ে মরে যাবে। উদাহরণতঃ কৃপণতার দাবী হচ্ছে ধন আটকে রাখা এবং ব্যয় না করা। কেউ যখন এর খেলাফ করবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে বারবার ব্যয় করবে, তখন কৃপণতা মরে যাবে এবং ব্যয় করার স্বভাব মজ্জাগত হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত আমলের মাধ্যমে কৃপণতার প্রতিকার বর্ণিত হল।

কিন্তু কৃপণতা স্বভাবটি মাঝে মাঝে এত শক্তিশালী হয় যে, মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ফলে, মানুষ এর অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং দানশীলতার উপকারিতাও বুঝে না। যখন এ দু'টি বিষয়ের জ্ঞানই অর্জিত হয় না, তখন আগ্রহ কোথা থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় এ রোগটি চিরস্থায়ী হয়ে যায়। যেমন, কোন রোগীর মধ্যে ঔষধের যথার্থ ব্যবহার সম্ভবপর না হলে তার মৃত্যুর জন্যে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

ধন-সম্পদ সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে কল্যাণ এবং একদিক দিয়ে অনিষ্ট। এটা যেন

সাপের মত। যারা মন্ত্র জানে, তারা সাপকে ধরে তার মধ্য থেকে বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী পাথরটি বের করে নেয়, যা অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি একে ধরলে তার মারাত্মক বিষে অঘোরে প্রাণ হারায়। নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় লক্ষ্য না রাখলে ধন-সম্পদের বিষ থেকে কেউ আত্মরক্ষা করতে পারে না।

প্রথমত, ধন-সম্পদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও কারণ জানতে হবে। এটা জানা হয়ে গেলে মানুষ যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই জীবিকা উপার্জন করবে এবং ততটুকুরই হেফাযত করবে।

দ্বিতীয়ত, উপার্জনের পন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যা পুরোপুরি হারাম, তা থেকে বেঁচে থাকবে। যা বেশীর ভাগ হারাম কিংবা মকরূহ, তা থেকেও বিরত থাকবে। উদাহরণতঃ কোন ঘুষখোরের হাদিয়া গ্রহণ করা এবং মানুষের কাছে হাত পেতে কোন কিছু গ্রহণ করা।

তৃতীয়ত, জীবিকার পরিমাণের প্রতি খেয়াল রাখবে, যাতে প্রয়োজনের বেশীও না হয়, কমও না হয়। প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এদের প্রত্যেকটির তিনটি করে স্তর রয়েছে- নিম্ন, উচ্চ ও মধ্যবর্তী স্তর।

চতুর্থত, ব্যয়ের খাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। হালাল উপার্জনকে হালাল খাতেই ব্যয় করবে।

পঞ্চমত অর্থ অর্জন, বর্জন, ব্যয় ও আটকে রাখার ক্ষেত্রে নিয়ত ঠিক রাখবে। অর্থাৎ যে অর্থ অর্জন করবে, তাতে এবাদতে সাহায্য লাভের নিয়ত করবে এবং যে অর্থ বর্জন করবে তাতে সংসার নির্লিপ্ততা ও ধন-সম্পদের নিকৃষ্টতার নিয়ত করবে। এরূপ করলে ধন-সম্পদের উপস্থিতি ক্ষতিকর হবে না।

এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেয় এবং নিয়ত আল্লাহ তা'আলার খাতিরেই হয়, তবু সে সংসারত্যাগীই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদ বর্জন করে এবং "আল্লাহর খাতিরে" নিয়ত না হয়, তবে সে সংসারত্যাগী হবে না। সুতরাং মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি ও স্থিরতা আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া উচিত। অর্থাৎ, গতি ও স্থিতি সেটাই করবে, যা এবাদত কিংবা এবাদতে সহায়ক। দেখ, এবাদতের সর্বাধিক পরিপন্থী কাজ হচ্ছে খাওয়া ও পায়খানা করা। কিন্তু এগুলোর দ্বারাও এবাদতে সহায়তা

হয়। সুতরাং যদি কেউ সহায়তার নিয়তে আহার ও পায়খানা করে, তবে এগুলো তার জন্যে এবাদত হিসাবে লেখা হবে। এমনিভাবে জামা, পায়জামা, বিছানা, পাত্র ইত্যাদির হেফাযতেও এই নিয়ত রাখা উচিত। কেননা, ধর্মকর্মে এগুলোরও প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ধন-সম্পদ থাকে, তাতে আল্লাহর কোন বান্দার উপকার করার নিয়ত করবে। সুতরাং কোন সময় কেউ এরূপ বস্তু চাইলে তাকে দিতে অস্বীকার করবে না।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত নিয়মাবলী মেনে চলবে, ধন-সম্পদের আধিক্য তার জন্যে ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু এটা সে-ই অর্জন করতে পারে, যে ধর্মকর্মে পাকাপোক্ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, তারা এই মনে করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে যে, কতক সাহাবী বিত্তশালী ছিলেন এবং তাদের কাছে অগাধ ধনরাশি ছিল। আমিও তেমনি অর্থ সঞ্চয় করি। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা সেই নির্বোধ বালকের মত, যে কোন তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিকে সাপ ধরতে দেখে মনে করে, সে সুন্দর আকৃতি ও নরম ত্বকের কারণে সাপ ধরেছে। এরপর সে-ও তার দেখাদেখি সাপ ধরে এবং তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, সাপে কাটা ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে মরে গেছে। কিন্তু অর্থ-সম্পদ যাকে দংশন করে, সে মরে গেছে বলে জানা যায় না।

মোটকথা, পাহাড়ে চলাফেরা করা, নদীর তীরে ভ্রমণ করা এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে যেমন অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়, তেমনি ধনসম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ আলেমের সমান হতে পারে না।

প্রাচুর্যের নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা ঃ জানা উচিত যে, শোকরকারী ধনীর মর্তবা উচ্চে, না সবরকারী দরিদ্রের মর্তবা উচ্চে এ বিষয়ে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে কেবল এতটুকু লিখতে চাই যে, প্রাচুর্যের তুলনায় দারিদ্র্যই মোটামুটি উত্তম। দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখানে আমরা হারেছ মুহাসেবী (রহঃ)-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি, যা তিনি জনৈক ধনী আলেমের বক্তব্যের জওয়াবে এক পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেছেন। ধনী আলেম তার ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রমাণ স্বরূপ সাহাবায়ে

কেরামের প্রাচুর্য এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর বিপুল ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করে নিজেকে তাদের সাথে তুলনা করেছিলেন।

এলমে মোয়ামালায় হারেছ মুহাসেবীর জুড়ি নেই। নফসের দোষ-ত্রুটি, আমলের বিপদাপদ এবং এবাদতের স্বরূপ তিনি যতটুকু লিখেছেন অন্য কেউ ততটুকু লিখেননি। তিনি প্রথমে বলেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি হযরত ঈসা (আঃ) মন্দ আলেমদের সম্পর্কে বলেছেন—হে মন্দ আলেমগণ, তোমরা নামায পড়, রোযা রাখ এবং দান-খয়রাত কর। কিন্তু যা করতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তা কর না। তোমরা নিজে যা কর না, তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমাদের এ কাজ খুবই মন্দ। বাহ্যত তোমরা মুখে তওবা কর, কিন্তু অন্তরে রিপুর কামনা-বাসনা অনুযায়ী আমল কর। বাহিরকে পাকসাফ রেখে অন্তরকে নাপাক রাখা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আমি সত্য বলছি, তোমরা চালনির মত হয়ো না, যার ভিতর দিয়ে উত্তম আটা বের হয়ে যায় এবং ভুষি থেকে যায়। তোমাদের মুখ দিয়েও প্রজ্ঞার কথাবার্তা বের হয় কিন্তু অন্তর আবর্জনায় পূর্ণ। হে দুনিয়ার সেবাদাসরা, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে তার খাহেশ ও আগ্রহ ছিন্ন করে না, সে আখেরাত কিরূপে পাবে? আল্লাহর কসম, তোমাদের অন্তর তোমাদের আমল দেখে কাঁদে। দুনিয়াকে তোমরা জিহ্বার নিচে রেখেছ এবং আমলকে পায়ের নিচে। তোমাদের কাছে দুনিয়ার কল্যাণ আখেরাতের কল্যাণ অপেক্ষা উত্তম। তোমরা নিজেদের আখেরাত বরবাদ করেছ। তোমরা আর কতদিন অন্ধকারের পথিকদেরকে পথ বলে দেবে এবং নিজেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। মনে হয়, তোমরা দুনিয়াদারদের হাত থেকে দুনিয়াকে এজন্যে ছাড়িয়ে নাও, যাতে সবটুকু দুনিয়াই তোমাদের কুক্ষিগত হয়ে যায়। যদি তোমাদের মুখ থেকে এলমের নূর বের হয় এবং অন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তবে এতে লাভ কি? হে দুনিয়ার দাসরা, তোমরা পরহেযগার নও— স্বাধীনচেতা বুযুর্গগণের মতও নও। অতএব, আশ্চর্যের কি থাকতে পারে যদি দুনিয়া তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে উপুড় করে মাটিতে নিক্ষেপ করে এবং এমনি অবস্থায় হেঁচড়াতে শুরু করে। তোমাদের পাপ তোমাদের মাথার কেশ ধরে রাখবে এবং এলম পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেবে। এরপর তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবে। সেখানে না থাকবে কোন সঙ্গী, না থাকবে কোন

সহানুভূতিশীল ব্যক্তি। অতঃপর সেখানে তোমরা নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

এরপর হারেছ মুহাসেবী বলেন ঃ এ হচ্ছে আলেমদের অবস্থা। এরাই মানুষরূপী শয়তান এবং সকল ফেতনার কারণ। এরা দুনিয়া তথা জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদার লোভে আখেরাতকে ত্যাগ করেছে এবং ধর্মকে অপমানিত করেছে। আল্লাহ তা'আলা নিজের কৃপায় ক্ষমা না করলে এরা আখেরাতে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর জানা দরকার, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিমজ্জিত থাকে, আমি দেখেছি, তার আনন্দ অমলিন নয়। সে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টে জড়িত থাকে এবং তার দ্বারা বিভিন্ন পাপকর্ম সম্পাদিত হয়। পরিণামে ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া সে কিছুই পায় না। সে আশায় আশায় সুখী থাকে; কিন্তু না পায় দুনিয়া, না ধর্ম ঠিক থাকে।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

অর্থাৎ, সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

আহা! এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হবে। ভাইসব, আল্লাহকে ধ্যান কর, শয়তানের চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হয়ো না এবং শয়তানের বন্ধুদের ধোকায় পড়ো না। যারা মিথ্যা দলীলের ভিত্তিতে দুনিয়া অর্জন করার কাজে ডুবে রয়েছে, তারা এ জন্যে এই ওযর পেশ করে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের কাছেও বিপুল ধনরাশি ছিল। এটা এ জন্যে করে, যাতে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ে মানুষ তাদেরকে ক্ষমাযোগ্য মনে কর। অথচ এটা শয়তানের একটি কুমন্ত্রণা, যা তারা টের পাচ্ছে না। হে হতভাগারা, আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধন-সম্পত্তির প্রমাণ পেশ করা তোমাদের জন্যে শোভা পায় না। শয়তান তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে তোমাদের মুখ থেকে এই প্রমাণ বের করায়। কেননা, যখন তোমরা বল, সাহাবায়ে কেরাম অগাধ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, তখন তাদের গীবত করে এবং তাদের প্রতি দোষারোপ কর। আর যখন বল, হালাল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা তা বর্জন করার চেয়ে উত্তম, তখন তোমরা যেন রসূলে করীম (সাঃ) ও পয়গম্বরগণকে ভ্রান্ত ও অজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন কর, আর বল যে, তাঁরা অযথাই

সংসারবিমুখতা অবলম্বন করেছিলেন। ধন-সঞ্চয়ের যে তত্ত্ব তোমরা আবিষ্কার করেছ, তা তারা বুঝতে সক্ষম হননি। অন্যথায় তোমাদের মত তাঁরাও ধন-সঞ্চয় করতেন। তোমাদের বক্তব্য থেকে এ কথাও জরুরী হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; অর্থাৎ, তিনি অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তোমাদের ধারণায় অর্থ সঞ্চয় করা উম্মতের জন্যে অধিক কল্যাণকর। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন উম্মতকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা না দিয়ে ধোকা দিয়েছেন। আল্লাহর কসম, তোমাদের এ সব বক্তব্য প্রলাপোক্তি ছাড়া কিছুই নয়। রসূলে করীম (সাঃ) উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন।

তোমরা অর্থ সঞ্চয় করাকে উত্তম বলে থাক। এ থেকে এটাও জরুরী হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেননি। কারণ, তিনি আমাদেরকে অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থ সঞ্চয় করার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব একথা আল্লাহ তা'আলা জানতে পারলেন না এবং না জেনেই নিষেধ করে দিয়েছেন। আর তোমরা অর্থের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব চমৎকাররূপে জেনে নিয়েছ। তাই অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছ। আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ মূর্খতা থেকে রক্ষা করুন।

আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধনরাশিকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী নয়। কিয়ামতের দিন তিনি নিজে বাসনা প্রকাশ করবেন যে, দুনিয়াতে যদি আমি কোনরূপে জীবনধারণ করার মত জীবিকা পেতাম, তবেই ভাল হত। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, যখন আবদুর রহমান ইবনে আওফের ওফাতের পর কোন কোন সাহাবী বললেন ঃ হযরত আবদুর রহমান যে ধন-সম্পদ ছেড়ে গেছেন, সে কারণে তার জন্যে আমাদের খুব ভয়। হযরত কা'ব (রাঃ) বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, ভয় কিসের। তিনি হালাল ধন-সম্পদ উপার্জন করেছেন, হালাল পথে ব্যয় করেছেন এবং হালাল উপার্জন ছেড়ে গেছেন। হযরত কা'বের এই উক্তি কেউ গিয়ে আবুযর গেফারী (রাঃ)-এর কাছে বলে দিল। তিনি রাগে অস্থির হয়ে গেলেন এবং একটি চুলের রশি হাতে নিয়ে কা'বের খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। কা'ব এ সংবাদ অবগত হয়ে পলায়ন করলেন এবং খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হয়ে

ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবু যরও তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে হযরত উসমানের ঘরে আগমন করলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই কা'ব খলীফার পেছনে গিয়ে বসলেন। হযরত আবুযর তাঁকে লক্ষ্য করে সজোরে বললেন ঃ হে ইহুদীর বাচ্চা, তুমিই বলেছিলে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ যে সম্পত্তি ছেড়ে গেছে, তাতে কোন দোষ নেই! অথচ রসূলে আকরাম (সাঃ) একবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে গমন করেন। সেখানে তিনি আমাকে ডাক দিলেন ঃ আবুযর! আমি জওয়াব দিলাম ঃ লাব্বায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ (অর্থাৎ, আমি হাযির আছি)। তিনি বললেন ঃ

الاكثرون هم الاكثرون يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه وهم قليل -

অর্থাৎ, অধিক ধনশালীই কিয়ামতের দিন স্বল্প পুঁজিবিশিষ্ট হবে, কিন্তু যে ডান হাতে ও বাম হাতে, অগ্রে ও পশ্চাতে এমন এমন করবে। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম হবে।

এরপর তিনি আবার আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি লাব্বায়েকা বললে তিনি এরশাদ করলেন ঃ যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড়ের সমান ধন-ভাণ্ডার থাকে, আমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করি. কিন্তু মৃত্যুর দিন তা থেকে দুটি যব পরিমাণও আমার পরে অবশিষ্ট থেকে যায়, এটাকে আমি ভাল মনে করি না। আমি আরয করলাম। ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি দুটি স্তূপের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ না, বরং দুটি যব অবশিষ্ট থাকার কথা বলছি। আমি তো কম বলি, আর তুমি বাড়িয়ে বল। এখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো একথা বলেন, আর তুমি ইহুদীর বাচ্চা হয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফের বিরাট সম্পত্তি ছেড়ে যাওয়ার ভেতরে কোন দোষ দেখতে পাও না! তুমিও মিথ্যুক এবং যে একথা মানে, সে-ও মিথ্যুক। হযরত আবুযরের এই স্পষ্টোক্তির জওয়াব কোন সাহাবী দেননি। তিনি তাঁর কথা বলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা আরও হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের পণ্যবাহী উট এয়ামন থেকে ফিরে এসে মদীনায় হঠাৎ ধুমধাম ও

গোলমালের আওয়াজ শুনা যেতে লাগল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ গোলমাল কিসের? লোকেরা আরয করল ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের উট এসেছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও রসূল সত্য বলেছেন। হযরত আবদুর রহমান এই সংবাদ পেয়ে এই হাদীসটি সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— আমি জান্নাতে মুহাজির ও মুসলমানদের মধ্যে যারা ফকীর, তাদেরকে খুব দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছি এবং ধনীদের কাউকে তাদের সাথে জান্নাতে যেতে দেখিনি। তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ হামাগুড়ি দিয়ে তাদের সাথে যাচ্ছিল। হযরত আবদুর রহমান এই হাদীস শুনে বললেন ঃ এই উটগুলো তাদের সমুদয় বোঝাসহ আল্লাহর ওয়াস্তে খয়রাত। আর যে সকল গোলাম এসব উটের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাদেরকেও আমি মুক্ত করে দিলাম, যাতে ফকীরদের সাথে আমিও দৌড়ে জান্নাতে যেতে পারি।

আমরা আরও একটি রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, রসূলে করীম (সাঃ) একবার আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন ঃ আমার উম্মতের ধনীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে যাবে; কিন্তু সম্ভবত হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবে।

হযরত আবদুর রহমান তাকওয়া, অনুগ্রহ ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে অগ্রণী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর পবিত্র সংসর্গপ্রাপ্ত এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি ধন-সম্পদের কারণে কিয়ামতের ময়দানে ফকীরদের পিছনে পড়ে থাকবেন। অথচ এই ধন-সম্পদ তিনি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছিলেন, যাতে অপরের কাছে সওয়াল করতে না হয়। এই ধন-সম্পদ দ্বারা তিনি মানুষের উপকারও করেছেন। নিজের জন্যে মধ্যবর্তী পন্থায় ব্যয় করেছেন এবং আল্লাহর পথে বিস্তর লুটিয়েছেন। তবু তিনি জান্নাতে মুহাজির ফকীরদের সাথে দৌড়ে যেতে পারবেন না। তাঁরই যখন এই অবস্থা, তখন আমরা যারা দুনিয়ার ব্যস্ততায় নিমজ্জিত, আমাদের কি অবস্থা হবে?

আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা সর্বদা সন্দেহযুক্ত ও হারাম ধন-সম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং এই হাতের ময়লার জন্যে অন্যদের সাথে দম্ভ প্রদর্শন করতে থাক। তোমরা খাহেশ, সাজসজ্জা, আত্মগর্ব ও নানা ধরনের

অবাঞ্ছিত কাজে আবদ্ধ রয়েছ। এমতাবস্থায় আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধন-সম্পদের প্রমাণ কেমন করে পেশ করতে পার? এটা শয়তানী তুলনা। শয়তান তার বন্ধুদেরকে এমনি ধরনের প্রমাণাদি তালীম দিয়ে থাকে।

এখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের, সাহাবায়ে কেরামের এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অবস্থা বর্ণনা করে শুনাচ্ছি, যাতে তোমরা নিজেদের নিকৃষ্টতা ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে পার। জানা উচিত যে, কোন কোন সাহাবীর কাছে অর্থ-সম্পদ থাকার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল অপরের কাছে সওয়াল না করা এবং আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করা। তাঁরা হালাল উপায়ে উপার্জন করেছেন, পবিত্র ধন ভোগ করেছেন এবং মধ্যবিত্তের ন্যায় পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করেছেন। তারা দুনিয়াতে কারও হক নষ্ট করেননি এবং কার্পণ্য করেননি; বরং নিজেদের অধিকাংশ ধন-সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে দান করেছেন। কোন কোন সাহাবী তাদের সমুদয় অর্থই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরাও কি তেমনি? না, তোমরা এরূপ হতে যাবে কেন? বিশ্ব-জাহানের সাথে সামান্য মাটির কি তুলনা?

এছাড়া অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন দারিদ্র্যপ্রিয়, নিঃস্বতার ভয় থেকে মুক্ত, জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, তাকদীরে সন্তুষ্ট, বিপদাপদে সম্মত, নেয়ামতের শোকরকারী, দুঃখ-কষ্টে সবরকারী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর প্রশংসাকারী এবং গর্ব ও অহংকার থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন বল, তোমরাও কি তেমনি?

তাঁদের নীতি ছিল দুনিয়ার ঐশ্বর্য তাঁদের হাতে এসে গেলে তাঁরা দুঃখ করে বলতেন— মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা কোন গোনাহের আযাব দুনিয়াতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার আগমনকে শাস্তি মনে করতেন। পক্ষান্তরে যখন দারিদ্র্যকে আসতে দেখতেন, তখন খুশী হয়ে বলতেন—ভাল হয়েছে। সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য আমরা প্রাপ্ত হয়েছি।

বর্ণিত আছে, জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ সকাল বেলায় ঘরে কিছু সামগ্রী দেখলে দুঃখিত ও বিষণ্ন হতেন, আর গৃহে কিছু না থাকলে প্রফুল্ল হতেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ তো ঘরে কিছু না থাকলে দুঃখ করে এবং থাকলে খুশী থাকে। আপনার অবস্থা এর বিপরীত কেন? তিনি

বললেন ঃ কারণ, আমি সকাল বেলায় উঠে যখন পরিবার-পরিজনের কাছে কিছু না দেখি, তখন এই ভেবে আনন্দিত হই যে, আজ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ নসীব হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন ঘরে কিছু থাকে, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ না হওয়ার কারণে দুঃখিত হই। মোটকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অবস্থা ছিল এই। আমরা এখানে কমই লিপিবদ্ধ করেছি। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অসংখ্য ও অগণিত। এখন তোমরা বল, তোমাদের অবস্থাও কি তেমনি? নাউযুবিল্লাহ, তোমরা এরূপ হবে কেন? তোমাদের অবস্থা তো সম্পূর্ণ তাদের বিপরীত। তোমরা প্রাচুর্যে ঔদ্ধত্য কর, সহজলভ্যতায় গর্ব কর এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বিলাসিতা কর এবং নেয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতায় গাফেল হয়ে যাও। বিপদ এলে তোমরা ক্রুদ্ধ হও এবং নিঃস্বতায় নিরাশ হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর বিধি-বিধানে খুশী নও। দারিদ্র্যকে খারাপ মনে কর এবং মিসকীনীর কারণে অতিষ্ঠ হয়ে যাও। অথচ মিসকীনীর কারণে পয়গম্বরগণ গর্ব করতেন। তাঁদের গর্বের বস্তু তোমাদের কাছে মন্দ। দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে থাক। এতেও আল্লাহর প্রতি কুধারণা করা হয় এবং তিনি রিযিক পৌঁছানোর যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তা বিশ্বাস না করা জরুরী হয়ে পড়ে। এতটুকু গোনাহ কি কম? আমার মনে হয়, তোমরা দুনিয়ার আনন্দ, কামনা-বাসনা এবং জাঁকজমক অর্জনের জন্যেই ধন-সম্পদ সঞ্চয় কর। অথচ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দুষ্ট লোক তারাই, যারা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং এতেই তাদের বপু ফুলে-ফেঁপে উঠে। জনৈক আলেম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু লোক তাদের পুণ্যসমূহ দেখতে চাইবে। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا -

অর্থাৎ, তোমরা পার্থিব জীবনেই তোমাদের পবিত্র বস্তুসমূহ বিনষ্ট করেছ এবং সেখানেই ভোগ করেছ।

অর্থাৎ তোমরা কি জান না যে, দুনিয়ার নেয়ামতের কারণে আখেরাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছ? জিজ্ঞাসা করি, এর চেয়ে বেশী বিপদ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হবে?

আশ্চর্য নয় যে, তোমরা গর্ব, অহংকার ও জাগতিক সাজসজ্জার জন্যে ধনৈশ্বর্য সঞ্চয় কর। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি গর্ব, অহংকার ও প্রাচুর্যের জন্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে, সে আল্লাহর কাছে এমনভাবে যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। হয়তো বা আল্লাহর কাছে যাওয়া অপেক্ষা দুনিয়াতে থাকা তোমাদের কাছে উত্তম। এ কারণেই আল্লাহর দীদারকে খারাপ মনে কর। অথচ আল্লাহ স্বয়ং তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ কর। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ اَسِفَ عَلٰى دُنْيَا فَاتَتْهُ اِقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةَ سَنَةٍ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়া ফওত হয়ে যাওয়ার কারণে অনুতাপ করে, সে এক বছরের পথ পরিমাণ দোযখের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

কিন্তু অনুতাপ করলে যে আযাব নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তোমাদের এ বিষয়ে পরওয়া নেই। বরং আশ্চর্য নয় যে, দুনিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে তোমরা দ্বীন থেকেও বের হয়ে যাবে। দুনিয়ার আগমনে তোমরা আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে যাও। তোমাদের খবর নেই যে, হাদীসে বলা হয়েছে —

مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَسُرَّ بِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهٖ -

অর্থাৎ, যে দুনিয়াকে ভালবাসে এবং তাকে নিয়ে আনন্দ করে, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দুনিয়া হ্রাস পাওয়ার তুলনায় গোনাহের বিপদ তোমাদের কাছে হালকা মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। কেননা, তোমরা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ভয় বেশী কর এবং গোনাহের কম। হাতের এই ময়লা থেকে যা কিছু দীন-দুঃখীকে দান কর, তাও উচ্চ মর্যাদা ও অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের নিয়তেই দান কর। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেও মানুষ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক এবং তোমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুক, এই থাকে তোমাদের কামনা। অর্থাৎ, কিয়ামতে আল্লাহ তোমাদেরকে হেয় জ্ঞান করুন—এটা দুনিয়াতে মানুষের হেয় জ্ঞান করার তুলনায় তোমাদের কাছে সহজতর।

নিজেদের দোষত্রুটি মানুষের কাছে গোপন রাখ; কিন্তু আল্লাহ যে জানেন, তার পরওয়া নেই। মানুষের কদর যেন তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে বেশী। নাউযুবিল্লাহ। যখন এতগুলো দোষ তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং এমন সব আর্বজনার সাথে তোমরা জড়িত, তখন জ্ঞানীদের সামনে কোন্ মুখে বল, তোমাদের ধন-সম্পদও আল্লাহর নেক বান্দাদের ধন-সম্পদের মত? অথচ তোমরা কোথায় এবং তারা কোথায়? তারা তো হালাল সম্পদের প্রতিও এতটুকু বিমুখ ছিলেন, যা তোমরা হারাম সম্পদের প্রতিও নও। তাদের দ্বারা সগীরা গোনাহ হয়ে গেলে তারা তাকে এতবড় মনে করতেন, যা তোমরা কবিরা গোনাহকেও কর না। যদি তোমাদের হালাল ও পবিত্র ধন-সম্পদ তাদের সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদের মতও হত, তবে তা হত ভাগ্যের কথা। হায়, তোমরা যদি তোমাদের কুকর্মের কারণে এতটুকু ভীত হতে, যতটুকু তারা তাঁদের সৎকর্ম কবুল না হওয়ার ভয়ে ভীত হতেন। অথবা তোমাদের রোযা রাখা যদি তাঁদের রোযা না রাখার সমান হত! অথবা তোমাদের পরিশ্রম তাঁদের এবাদতের অলসতা ও ঘুমের সমতুল্য হত! অথবা তোমাদের সমস্ত নেকী তাদের একটি নেকীরই সমান হত! এক রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক সাহাবী বলেন ঃ সিদ্দীকগণ থেকে যে পরিমাণ দুনিয়া ফওত হয়ে যায় এবং আলাদা থাকে, সে পরিমাণে তাদের জন্যে সেটা আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন নয়, সে তাদের সঙ্গী দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়।

এখন দেখা উচিত যে, উভয়পক্ষের পার্থক্য কতটুকু। এক পক্ষ সাহাবায়ে কেরাম, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে উচ্চ মর্তবার অধিকারী এবং অপরপক্ষ তোমরা এবং তোমাদের মত লোক, যারা নিম্নতম মর্যাদার অধিকারী; কিন্তু যদি আল্লাহ পাক নিজের কৃপায় ক্ষমা ও মার্জনা করেন।

হে উদ্ধত, তোমরা বল, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণেই তোমরা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে থাক, যাতে সওয়ালের প্রয়োজন না থাকে এবং আল্লাহর পথে দান করা যায়। তোমাদের চিন্তা করা উচিত, সাহাবায়ে কেরামের আমলে হালাল উপার্জন যতটুকু সহজলভ্য ছিল, বর্তমান যুগে তা আছে কি না। তাঁরা হালাল উপার্জনে যে পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন, তোমাদের দ্বারা তা সম্ভবপর কি না। আমি কোন এক সাহাবী

সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলতেন ঃ আমরা হালাল উপায়ের সত্তরটি পথ একারণে বর্জন করতাম যে, কোথাও হারামে লিপ্ত হয়ে না পড়ি! তোমরাও কি নিজেদের তরফ থেকে এ ধরনের সাবধানতার আশা কর? আল্লাহর কসম, তোমরা এমন সাবধানতা অবলম্বন করবে— তা আমি কখনও আশা করি না। নিশ্চিত জেনো, অনুগ্রহ ও সৎকর্মের জন্যে ধন সঞ্চয় করা শয়তানের একটি প্রতারণা। সে অনুগ্রহ ও দান-খয়রাতের বাহানায় তোমাদেরকে সন্দেহযুক্ত ও হারাম মিশ্রিত ধন উপার্জনে লাগিয়ে দিতে চায়। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি দুঃসাহস করে সন্দেহযুক্ত কাজ করে, তার হারামে পড়ে যাওয়া খুব নিকটবর্তী।

হে গর্বিত, তোমাদের জানা দরকার যে, সন্দেহযুক্ত বস্তু উপার্জন করে আল্লাহর পথে দান করার তুলনায় সর্বক্ষণ সন্দেহে লিপ্ত হওয়াকে ভয় করা উত্তম, যাতে আল্লাহ পাকের সামনে সম্মান ও মর্তবা উচ্চ হয়। সেমতে আলেমগণ বলেন ঃ যদি এক ব্যক্তি হালাল না হওয়ার আশংকায় এক টাকা ত্যাগ করে, তবে এটা তার জন্যে সন্দেহযুক্ত এক হাজার আশরফী দান করার তুলনায় উত্তম। তোমরা যদি নিজেদেরকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু মনে কর, যে কারণে শয়তান তোমাদেরকে ধোকা দিতে পারবে না, তবে আমি বলি, তোমরা মুত্তাকী হলেও কিয়ামতের হিসাব নিজেদের উপরে রাখা উচিত নয়। কেননা, শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ কিয়ামত দিবসে! জিজ্ঞাসাবাদকে ভয় করতেন। সেমতে জনৈক সাহাবী বলেন ঃ যদি আমি প্রত্যহ এক হাজার আশরফী হালাল উপায়ে উপার্জন করি এবং সমস্তই আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেই— এতে আমার জামাতের নামাযও বিঘ্নিত না হয়, তবু এরূপ দান-খয়রাত আমি পছন্দ করি না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ নিঃস্ব থাকলে আমি কিয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে যাব। ধনীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে—হে বান্দা! বল, কোথা থেকে তুমি উপার্জন করলে? কোথায় ব্যয় করলে? অতএব দেখ, এরা ছিলেন মুত্তাকী। সে যুগে হালাল বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও হিসাবের ভয়ে তাঁরা ধন-সম্পদ বর্জন করেছেন। আর তোমরা যে যুগে আছ, সে যুগে তো হালালের অস্তিত্বই নেই। অতএব, তোমরা কি সঞ্চয় করছ? কোন কোন সাহাবী তো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদও এই ভয়ে গ্রহণ করতেন না যে, কোথাও অন্তরে পরিবর্তন ও ভ্রষ্টতা এসে না

যায়। তোমরা কি নিজেদের অন্তরকে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক মুত্তাকী মনে কর? এরূপ মনে করলে তোমরা নফসে আম্মারার প্রতি খুব সুধারণা পোষণ করছ বলতে হবে। আমরা উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলছি, প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদ নিয়েই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সৎকর্ম করার উদ্দেশ্যে ধন সঞ্চয় করে হিসাবের সম্মুখীন না হওয়া উচিত। হাদীসে আছে—যাকে হিসাবে জড়িত করা হবে, সে আযাবে পতিত হবে।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে, যে হারাম উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছে এবং হারামেই ব্যয় করেছে। তাকে দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ হবে। অতঃপর এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যে হারাম উপায়ে উপার্জন করেছে এবং হালাল খাতে ব্যয় করেছে। তাকেও দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ হবে। এরপর তৃতীয় এক ব্যক্তিকে আনা হবে, সে হালাল উপায়েই উপার্জন করেছে এবং হালাল পথেই ব্যয় করেছে। তাকে বলা হবে ঃ থাম, সম্ভবত তুমি ধন-সম্পদের অন্বেষণে অন্য কোন ফরয কর্মে ক্রুটি করেছ। উদাহরণতঃ সঠিক সময়ে নামায আদায় করনি। অথবা রুকু, সেজদা ও উযু পূর্ণরূপে করনি। সে আরয করবে ঃ ইলাহী! আমি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছি এবং হালাল পথেই ব্যয় করেছি। তোমার ফরযসমূহের মধ্যে কোন ফরযেও ক্রুটি করিনি। বলা হবে সম্ভবত তুমি ধন-সম্পদের কারণে অহংকার করেছ অথবা যানবাহন ও পোশাকে গর্ব প্রকাশ করেছ। সে আরয করবে—ইলাহী! আমি অহংকারও করিনি এবং কোনরূপ গর্বও প্রকাশ করিনি। এরশাদ হবে—হয়তো যাদের হক তোমার উপর ফরয ছিল, তাদের কিছু হক আত্মসাৎ করেছ অথবা আত্মীয়, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে কিছু দান করনি। সে বলবে ঃ ইলাহী! আমি হালাল উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জন করেছি, হালাল পথে ব্যয় করেছি, তোমার কোন ফরয নষ্ট করিনি, অহংকার ও গর্বও করিনি এবং কারও হক আত্মসাতও করিনি। এরপরও তাকে বলা হবে—আমি তোমাকে পানাহার ও আনন্দের যে সব সামগ্রী দান করেছিলাম, সবগুলোর শোকর পেশ কর।

মোটকথা, এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ হতে থাকবে। এখন আমি বলি ঃ এই তৃতীয় ব্যক্তি, যে হালাল পথে উপার্জন করেছে, হালাল পথে ব্যয় করেছে এবং সকল হক ও ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করেছে, তাকেই যখন এপরিমাণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন আমাদের মত লোকের কি অবস্থা

হবে, যারা দুনিয়ার ফেতনা, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি, খাহেশ ও সাজসজ্জায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছি? হে হতভাগারা,এসব জিজ্ঞাসাবাদের কারণেই মুত্তাকীরা দুনিয়ার সাথে জড়িত হয় না এবং প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পদে সন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রকার সৎকর্ম সম্পাদন করে। তোমাদের উচিত, এহেন মুত্তাকীগণের অনুসরণ করা।

আর যদি একথাই মনে কর যে, তোমরা সর্বাধিক মুত্তাকী, ধন-সম্পদও হালাল পথে উপার্জন কর, ব্যয়ের মধ্যেও কারও হক তোমাদের যিম্মায় থাকে না, অন্তরে কোন বিরূপ পরিবর্তনও আসে না এবং সবকিছু আল্লাহর মরযী অনুযায়ী কর, তবে এমনটা হওয়া যদিও সম্ভব নয়, তবু তোমাদের উচিত প্রয়োজন পরিমাণ ধন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, কিয়ামতের দিন ধনীদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মুক্ত থাকা এবং প্রথম কাফেলাতেই জান্নাতে প্রবেশ করার গৌরব অর্জন করা।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—ফকীর মুহাজিরগণ জান্নাতে ধনীদের তুলনায় পাঁচশ' বছর পূর্বে প্রবেশ করবে। অন্য এক হাদীসে আছে—ফকীর মুমিনগণ জান্নাতে ধনীদের পূর্বে প্রবেশ করবে। তারা খাবে এবং মজা করবে। আর ধনীরা হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন ঃ আমার দাবী তোমাদের কাছেই। তোমরা মানুষের শাসক ও বাদশাহ ছিলে। বল, আমি যা কিছু দিয়েছি, তা থেকে তোমরা কি কি করেছ?

ভাইসব, এমন চেষ্টা কর, যাতে হালকা-পাতলা হয়ে পয়গম্বরগণের কাফেলায় শামিল হয়ে যাও এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে আলাদা হয়ে পেছনে পড়ে থাকাকে ভয় কর। আমি এমন রেওয়ায়েতও পেয়েছি যে, একজন সাহাবী তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চাইলে লোকেরা তাকে মধুর শরবত এনে দিল। তিনি যখন সেটি আস্বাদন করলেন, তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিজেও কাঁদলেন এবং উপস্থিত সকলকে কাঁদালেন। এরপর মুখ থেকে অশ্রু মুছে কিছু কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কান্না শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এই শরবতের কারণেই আপনি কাঁদছেন কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। কক্ষে আমরা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।

তিনি হঠাৎ বলতে লাগলেন ঃ আমার কাছ থেকে সরে যা। আমি আরয করলাম ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি তো আপনার সামনে কাউকে দেখছি না। আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? তিনি বললেন ঃ এ সময় দুনিয়া আমার দিকে তার মাথা বাড়িয়ে বলল ঃ আমাকে গ্রহণ কর। আমি তাকে বললাম ঃ আমার কাছ থেকে সরে যা। সে জওয়াব দিল—হে মোহাম্মদ, যদি আপনি আমার মোহ থেকে বেঁচেও থাকেন, তবে আপনার পরবর্তী লোকেরা আমার মোহ থেকে বেঁচে থাকবে না। তাই আমি আশংকা করছি, এই শরবত পান করে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে না বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

ভাইসব, এরা ছিলেন সৎলোক। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশংকায় কেঁদে বুক ভাসাতেন। আর তোমরা তো নানাবিধ নেয়ামত ও কামনা-বাসনায় মগ্ন। তোমাদের উপার্জনও হারাম ও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তোমরা হাবীবে পাক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় কর না। ধিক্কার তোমাদের প্রতি!

এক হাদীসে বলা হয়েছে—যদি এক ব্যক্তি আশরফীর থলি কোলে নিয়ে বণ্টন করে এবং অপর ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তবে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় যিকরকারী শ্রেষ্ঠ হবে। প্রথম সারির কোন এক তাবেঈকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দু'ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া অর্জন করল এবং তা দ্বারা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহায়তা করল। অপর ব্যক্তি এ থেকে অনেক দূরে সরে রইল। সে না দুনিয়া তলব করল, না পেল। এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তাবেঈ বললেন ঃ তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। যে দুনিয়া থেকে দূরে সরে রইল, সে শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে এবং অপর ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের তফাৎ। অতএব হে হতভাগ্য, যদি তোমরা দুনিয়া ছেড়ে দাও, তবে তোমরাও দুনিয়াদারদের উপর এই মর্তবা পেয়ে যাবে।

দুনিয়া ছেড়ে দেয়ার মধ্যে দুনিয়াতেও অনেক উপকারিতা রয়েছে। এতে দেহ আরাম পায়। অধিক পরিশ্রম করতে হয় না। জীবন সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত হয়। অতএব, ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার পক্ষে আর কি যুক্তি থাকতে পারে? ধরে নাও, যদি ধন সঞ্চয় করার মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকেও,

তবু তোমার উচিত উত্তম চরিত্রে রসূলে আকরাম (সাঃ) -এর অনুসরণ করা, যাঁর দৌলতে তোমরা হেদায়াত লাভ করেছ। তিনি যেমন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন, তোমরাও তেমনি কর। বিশ্বাস কর, দুনিয়া থেকে সরে থাকার মধ্যেই সৌভাগ্য ও সাফল্য নিহিত। অতএব, মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) -এর ঝাণ্ডা নিয়ে প্রথম দলে জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা কর।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ ঈমানদারদের নেতা সে ব্যক্তি, যে সকালের খাদ্য পেলে সন্ধ্যার পায় না, কর্জ চাইলে যাকে কেউ কর্জ দেয় না, যার ফরয অঙ্গ ঢাকার অতিরিক্ত পোশাক নেই এবং যে পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট হয়, সে পরিমাণ খেতে সক্ষম নয়; কিন্তু এরপরও যে সকাল-সন্ধ্যায় নিজের পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا -

অর্থাৎ, এরাই সেই সমস্ত মহাপুরুষের সঙ্গী হয়ে থাকবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, অর্থাৎ পয়গম্বর, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গী হবে। সঙ্গী হিসাবে এরা খুবই চমৎকার।

ভাইসব, এই বিবৃতির পর যদি তোমরা অর্থ সঞ্চয় কর এবং সৎকর্ম করার দাবী কর, তবে তোমাদের দাবী নির্জলা মিথ্যা হবে। সত্য এই যে, তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে বিলাসিতা, প্রাচুর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে এবং গর্ব, আত্মম্ভরিতা, রিয়া, খ্যাতি এবং সম্মান অর্জন করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে যাচ্ছ। আর মুখে বলছ, সৎকর্ম সম্পাদন করার জন্যে সঞ্চয় করছ। আল্লাহকে ধ্যান কর এবং মিথ্যা দাবীর জন্যে লজ্জিত হও। যদি দুনিয়ার ধন-সম্পদের মহব্বত তোমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে থাকে, তবে এটা মুখে স্বীকার কর। ধন সঞ্চয়ের সময় নিজেদেরকে হেয় মনে কর এবং নিজেদের ভুল স্বীকার কর। এছাড়া হাশরের দিনের হিসাবকে ভয় কর। এটা তোমাদের জন্যে মুক্তির কারণ হতে পারে। অর্থ সঞ্চয়ের পক্ষে অনর্থক প্রমাণাদি খোঁজ করে লাভ কি?

ভাইসব, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় হালাল বিদ্যমান ছিল। তাঁরা সর্বাধিক মুত্তাকী, খোদাভীরু ও সংসারবিমুখ ছিলেন। আজকাল হালাল

উপায় বিলুপ্ত। এমনকি, রোযকার খাদ্য এবং জরুরী অঙ্গ আবৃত করার বস্তুও হালাল উপায়ে সহজলভ্য নয়। সুতরাং এমন যুগে অর্থ সঞ্চয় করা থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

এছাড়া আমাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মত তাকওয়া, পরহেযগারী, সংসারবিমুখতা ও সাবধানতা কোথায় এবং তাদের অন্তর ও নিয়তের মত অন্তর ও নিয়ত কোথায়? আল্লাহর কসম, আমাদের অন্তর নফসের বিপদাপদে তার কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ। অতিসত্বর আমাদেরকে কিয়ামতে যেতে হবে। বড় ভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে সেদিন হালকা-পাতলা থাকবে। আর যারা বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক— হারাম ও হালাল একত্রে ভক্ষণকারী, সেদিন তাদের অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে।

আমি উপদেশ স্বরূপ তোমাদেরকে এসব কথা বলে দিলাম। এখন গ্রহণ করা তোমাদের কাজ। তবে যারা গ্রহণ করবে—এমন লোকের সংখ্যা খুবই বিরল। আল্লাহ পাক বিশেষ রহমতে আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

এ পর্যন্ত হারেছ মুহাসেবী (রহঃ)-এর উক্তি সমাপ্ত হল। এ থেকে প্রাচুর্যের উপর দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুন্দর প্রতীয়মান হল। এতটুকুই যথেষ্ট। তবে এরই সমর্থক আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। তা এই ঃ একবার ছা'লাবা ইবনে হাতেব আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ)! আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে ধন-সম্পদ দান করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে ছা'লাবা, অল্প ধন-সম্পদ, যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে, অনেক ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তম যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে না। ছা'লাবা আরয করলেন ঃ আপনি দোয়া করুন, যাতে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হই। এরশাদ হল ঃ ছা'লাবা, তুমি কি আমার অনুসরণ কর না? আল্লাহর কসম, যদি আমি ইচ্ছা করি যে, পাহাড় সোনা-রূপায় রূপান্তরিত হয়ে আমার সাথে সাথে চলুক, তবে তা সম্ভব। ছা'লাবা আবার আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন। যদি আপনার দোয়ায় আমি ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হই, তবে আমি সকল হকদারের হকও আদায় করব, তদুপরি এটা করব, ওটা করব। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ ইলাহী! ছা'লাবাকে ধন-সম্পদ দান কর। এরপর থেকে ছা'লাবার অল্প সংখ্যক ছাগল পিঁপড়ার ন্যায় বেড়ে যেতে লাগল। এমনকি

তার পক্ষে মদীনায় থাকা সম্ভব হল না। তিনি ছাগপালসহ মাঠে-ময়দানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। কেবল যোহর ও আসরের জামাতে হাযির হতেন এবং অন্যান্য জামাত ছেড়ে দিতেন। এরপর ছাগলের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। ফলে, সেই জঙ্গলে থাকাও আর সম্ভব হল না। তিনি আরও দূরে এক জায়গায় চলে গেলেন এবং কেবল জুমআর নামাযের জন্যে মদীনায় আসতেন।

এদিকে ছাগলের সংখ্যা পিঁপড়ার মত অনবরত বেড়েই চলল। অবশেষে তিনি জুমআর নামাযও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। জুমআর দিন পথিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংবাদ জিজ্ঞেস করে নিতেন। এ দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন সাহাবায়ে কেরামের কাছে ছা'লাবার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তারা ছাগলের প্রাচুর্য, ছা'লাবার মদীনা ত্যাগ এবং ক্রমান্বয়ে জামাত বর্জন করার বৃত্তান্ত শুনালেন। সব কথা শুনে তিনি তিনবার বললেন ঃ وَيْحَ ثَعْلَبَةَ —ছা'লাবার দুর্ভোগ!

এ সময়েই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ -

অর্থাৎ, আপনি মুসলমানদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা তাদেরকে পাকসাফ করে দেবে এবং তাদেরকে দোয়া দিন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা।

এতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে জুহায়না গোত্রের কাছ থেকে এবং এক ব্যক্তিকে সুলায়ম গোত্রের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে নিযুক্ত করলেন । তিনি যাকাত সম্পর্কিত ফরমান লিখে তাদের কাছে দিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা মদীনার বাইরে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় কর। ছা'লাবা ইবনে হাতেব এবং বনী সুলায়মের অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে যাকাত আদায় করবে।

সেমতে উভয় আদায়কারী মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে ছা'লাবার

কাছে গেল এবং তার ধন-সম্পদের যাকাত চাইল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লিখিত ফরমানও ছা'লাবার সামনে পেশ করল। তিনি বললেন ঃ এটা তো জরিমানা! ভাই এটা জরিমানা! তোমরা যাও, অন্য জায়গার কাজ শেষ করে আমার কাছে এসো। সেমতে তারা উভয়েই সুলায়ম গোত্রের লোকটির কাছে গেল এবং যাকাত চাইল। সে শুনামাত্রই উঠে গেল এবং তার উটগুলোর মধ্য থেকে বেছে বেছে সর্বোত্তম উট যাকাতের জন্যে আলাদা করল। এরপর তাদের সামনে উপস্থিত করে বলল ঃ এগুলো যাকাতের উট। উট দেখে আদায়কারীরা বলল ঃ সর্বোৎকৃষ্ট উট যাকাতে দেয়া তোমার উপর ফরয নয়। আমরা এগুলো নেব না। লোকটি আরয করল ঃ আপনারা এগুলোই নিন। আমি মনের খুশীতে দিচ্ছি এবং এজন্যেই এখানে উপস্থিত করেছি।

মোটকথা, তারা সব জায়গা থেকে যাকাত আদায় করে পুনরায় ছা'লাবার কাছে এসে যাকাত চাইল। ছা'লাবা বলল ঃ তোমরা আমাকে লিখিত আদেশ দেখাও। আদেশ দেখার পর সে আবার বলল ঃ এটা তো জরিমানা! ভাই এটা জরিমানা! তোমরা এখন যাও। আমি চিন্তা করে দেখি।

অতঃপর আদায়কারীদ্বয় মদীনায় ফিরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদের কথা বলার আগেই বললেন ঃ ছা'লাবার দুর্ভোগ! তিনি সুলায়ম গোত্রের লোকটির জন্যে নেক দোয়া করলেন। অতঃপর তারা উভয়েই বর্ণনা করল যে, ছা'লাবা এমন করেছে এবং বনী সুলায়মের লোকটি এই ব্যবহার করেছে। তখনই ছা'লাবা সম্পর্কে কোরআন পাকের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّا اٰتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ
وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ
يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -

অর্থাৎ, "তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই দান করব এবং সৎকর্মপরায়ণদের দলভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা কৃপণতা করল এবং অঙ্গীকারের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। তারা যে মিথ্যা কথা বলেছিল এবং আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করল, একারণে আল্লাহ তাদের অন্তরে কপটতা স্থাপন করে দিলেন সে দিন পর্যন্ত যেদিন তারা আল্লাহর সাথে দেখা করবে।"

তখন মজলিসে ছা'লাবার এক আত্মীয় উপস্থিত ছিল। সে আয়াতটি শুনল এবং ছা'লাবার কাছে গিয়ে বলল ঃ তোমার মা মরুক, আল্লাহ তা'আলা তোমার সম্পর্কে এমন নির্দেশ নাযিল করেছেন। ছা'লাবার চৈতন্য ফিরে এল। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আবেদন করলেন ঃ আমি যাকাত দিচ্ছি। আপনি গ্রহণ করুন। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমার যাকাত গ্রহণ করতে আল্লাহ পাক আমাকে বারণ করেছেন। এ কথা শুনে ছা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন করেছিলে, তেমনি ফল পেয়েছ। আমি যা বলেছিলাম, তা তুমি মানলে না। তিনি যখন দেখলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার যাকাত কবুল করবেনই না, তখন বাড়ীতে ফিরে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকরের খেদমতে যাকাত উপস্থিত করা হলে তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমরের খেদমতে পেশ করা হলে তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর ছা'লাবা মৃত্যুমুখে পতিত হল।

অতএব, উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা উচিত যে, ধন-সম্পদের ঔদ্ধত্য ও দুর্ভাগ্য কতটুকু। দারিদ্র্যে বরকত এবং প্রাচুর্যে অমঙ্গল নিহিত বিধায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের জন্যে এবং পরিবারবর্গের জন্যে দারিদ্র্যকে পছন্দ করেছেন। এমরান ইবনে হুসায়ন বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মর্যাদাশালী মনে করতেন। একবার তিনি আমাকে বললেন— হে এমরান, তুমি আমার কাছে মর্যদাশালী ব্যক্তি। আমার আদরের দুলালী ফাতেমা অসুস্থ। তাকে দেখার জন্যে ইচ্ছা হলে তুমি আমার সাথে চল। আমি আরয করলাম ঃ খুব ভাল। অতঃপর আমরা উভয়েই হযরত

ফাতেমার ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আসসালামু আলাইকুম। আমি ভেতরে আসব? হযরত ফাতেমা জওয়াব দিলেন ঃ আসুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি এবং আমার সঙ্গী উভয়েই আসব? প্রশ্ন হল ঃ আপনার সঙ্গী কে? তিনি বললেন ঃ এমরান ইবনে হুসায়ন। হযরত ফাতেমা আরয করলেন ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে একটি "আবা" (আরবদেশীয় পরিচ্ছদ বিশেষ) ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতে ইশারা করে বললেন ঃ সেটি এভাবে শরীরে জড়িয়ে নাও। তিনি আরয করলেন ঃ শরীর তো ঢেকে নিয়েছি। এখন মাথা কেমন করে ঢাকব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পুরনো চাদরটি তাঁর কাছে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এর দ্বারা মাথা ঢেকে নাও। এরপর হযরত ফাতেমা আমাদেরকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্দরে গিয়ে বললেন ঃ হে কলিজার টকুরা, আসসালামু আলাইকুম, আজ তোমার অবস্থা কেমন? তিনি আরয করলেন। আমার ব্যথা আছে। এই ব্যথার সাথে আরেকটি ব্যথা যোগ হয়েছে যে, আজ আমার কাছে খাওয়ার কিছুই নেই। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে কলিজার টকুরা, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহর কসম, আমি তিন দিন ধরে কিছুই খাইনি। আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে আমার মর্তবা বেশী। আমি আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি আমাকে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু আমি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ফাতেমার কাঁধে হাত মেরে বললেন ঃ তোমাকে সুসংবাদ। তুমি জান্নাতী মহিলাদের সরদার। হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরয করলেন ঃ তাহলে ফেরাউন-পত্নী আছিয়া, এমরান-তনয়া মরিয়ম ও খুয়ায়লিদ-তনয়া খাদীজা কোথায় থাকবেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা নিজ নিজ যুগের মহিলাদের সরদার ছিলেন। আর তুমি তোমার যুগের মহিলাদের সরদার। তোমরা সবাই পুষ্পরাগ-নির্মিত ও চুনি-পান্না খচিত ঘরে বসবাস করবে। তাতে কোন প্রকার কষ্ট ও শোরগোল থাকবে না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। আমি এমন ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি, যে দুনিয়াতে সরদার এবং আখেরাতেও সরদার হবে।

এখন লক্ষ্য করা উচিত, হযরত ফাতেমা (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদরের দুলালী হয়েও কেমন দরিদ্র জীবন যাপন করেছেন এবং কিভাবে ধন-সম্পদ ত্যাগ করেছেন। যে কেউ পয়গম্বর ও ওলীগণের অবস্থা ও তাদের বাণীসমূহ অনুধাবন করবে, সে-ই নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে, ধন-সম্পদ না থাকা থাকার তুলনায় উত্তম তা যদিও দান-খয়রাতেই ব্যয়িত হয়। কেননা, হক আদায় করা, কামনা-বাসনা থেকে বেঁচে থাকা এবং দান-খয়রাতে ব্যয় করা সত্ত্বেও ধন-সম্পদের নিম্নতম অনিষ্ট এই যে, নিয়ত তারই সংশোধনে সদা ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহর যিকর হয় না। কারণ, মন ও মস্তিষ্ক খালি থাকলেই যিকর হতে পারে। ধন-সম্পদের ব্যস্ততায় মন খালি থাকে না।

জরীর (রহঃ) হযরত লায়ছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে রওয়ানা হল। তিনি তাকে সঙ্গে নিলেন এবং নদীর তীরে পৌঁছে নাশতা করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তিনটি রুটি। দুটি খেলেন এবং একটি বাকী রইল। হযরত ঈসা (আঃ) অতঃপর নদীতে গিয়ে পানি পান করে ফিরে এলেন। এসে দেখেন বাকী রুটিটি নেই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রুটি কে নিল? সে আরয করল ঃ আমি জানি না। অতঃপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথে একটি হরিণী পাওয়া গেল। তার সঙ্গে ছিল দুটি বাচ্চা। তিনি একটিকে ডাকলে সে কাছে এল। তিনি বাচ্চাটিকে যবাহ করে ভাজা করলেন এবং উভয়ে মিলে খেলেন। এরপর বাচ্চার অবশিষ্টাংশকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে যাও। বাচ্চাটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে জঙ্গলে চলে গেল। অতঃপর ঈসা (আঃ) লোকটিকে বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি তোমাকে এই মোজেযা দেখিয়েছেন। বল, রুটি কে নিয়েছে? সে জওয়াব দিল ঃ আমি জানি না। এরপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঝরনার কাছে পৌঁছলেন। তিনি তার হাত ধরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে অপর পারে চলে গেলেন। অতঃপর লোকটিকে বললেন ঃ তোমাকে এই মোজেযা প্রদর্শনকারী আল্লাহর কসম, বল, রুটি কে খেয়েছে? সে পূর্ববৎ আরয করল ঃ আমি জানি না। এরপর তারা এক জঙ্গলে গেলেন। সেখানে বসে হযরত ঈসা (আঃ) মাটি ও বালু একত্রিত করতে লাগলেন।

অতঃপর একটি স্তূপ তৈরি করে বললেন ঃ আল্লাহর আদেশে স্বর্ণ হয়ে যা। স্তূপটি অমনি স্বর্ণ হয়ে গেল। তিনি সেটিকে তিন ভাগ করলেন এবং বললেন ঃ এক ভাগ আমার, একভাগ তোমার এবং এক ভাগ সেই ব্যক্তির, যে রুটি খেয়েছে। একথা শুনতেই লোকটি বলে উঠল ঃ রুটি আমি খেয়েছি। তিনি বললেন ঃ এগুলো সব তুমিই রাখ। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) লোকটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ গন্তব্য পথে চলে গেলেন। লোকটি স্বর্ণের স্তূপ নিয়ে জঙ্গলে রয়ে গেল। এমন সময় দু'ব্যক্তি তার কাছে এল এবং তাকে হত্যা করে স্বর্ণস্তূপ নিয়ে যেতে চাইল। সে বলল ঃ মিছামিছি ঝগড়া করার প্রয়োজন কি? এটি আমরা সমান অংশে ভাগ করে নেব। আগে এক ব্যক্তি গ্রামে গিয়ে আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসুক। সেমতে তাদের একজন খাবার আনতে চলে গেল। পথিমধ্যে সে মনে মনে চিন্তা করল ঃ যদি খাবারে বিষ মিশ্রিত করে দেই, তবে দু'জনই মারা যাবে এবং গোটা স্বর্ণস্তূপটি আমিই পেয়ে যাব। সেমতে সে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিল। এদিকে দু'ব্যক্তি পরামর্শ করল যে, যদি তৃতীয় ব্যক্তি মারা যায়, তবে স্বর্ণস্তূপ আধা-আধি আমাদের ভাগে পড়বে। কাজেই সে খাবার নিয়ে আসতেই তাকে মেরে ফেলা উচিত। সেমতে যখন তৃতীয় ব্যক্তি খাবার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল, তখন উভয়ে মিলে তাকে হত্যা করল এবং তার আনীত সব খাবার খেয়ে ফেলল। আর যায় কোথায়? বিষক্রিয়ার ফলে তারাও সেখানে মরে পড়ে রইল। স্বর্ণস্তূপ যেমন ছিল, তেমনি জঙ্গলে পড়ে রইল। তার আশে-পাশে ছিল তিন ব্যক্তির মৃতদেহ। এমনি অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) ফেরার পথে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ এ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা। তোমরা এই দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক।

বর্ণিত আছে, হযরত যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করেন। তাদের কাছে দুনিয়ার বস্তুসামগ্রী যেমন অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি বলতে কিছুই ছিল না। তারা কবর খনন করে রেখেছিল। সকালে এসব কবর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখত এবং এগুলোর কাছে নামায পড়ত। জীবিকাস্বরূপ তারা জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় শাক চরে খেত। আল্লাহর কুদরতে সর্বপ্রকার শাক তাদের জন্যে সেখানে বিদ্যমান ছিল। হযরত যুলকারনাইন এই মর্মে তাদের সরদারের কাছে দূত পাঠালেন যে, বাদশাহ

যুলকারনাইন তোমাদেরকে তলব করেছেন। দূত এই বার্তা পৌঁছে দিলে সরদার বলল ঃ আমার কোন প্রয়োজন নেই। যদি তার কোন মতলব থাকে, তবে আমার কাছে আসতে বল। হযরত যুলকারনাইন এই জওয়াব অবগত হয়ে বললেন ঃ বাস্তবে সে ঠিকই বলেছে। সেমতে তিনি স্বয়ং সরদারের কাছে গিয়ে বললেন ঃ আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তুমি যেতে অস্বীকার করায় আমি নিজেই এসেছি। সরদার বলল ঃ আমার কোন প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই যেতাম। যুলকারনাইন বললেন ঃ আমি তোমাদের যে অবস্থা দেখছি, তেমনি আজ পর্যন্ত কারও দেখিনি। দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাদের কাছে নেই কেন? তোমরা সোনা-রূপা উৎপন্ন কর না কেন? এতে তো তোমাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসত। সরদার উত্তর দিল ঃ আমরা সোনা রূপাকে অশুভ বস্তু মনে করি। কারণ, এগুলো যে-ই পায়, তার মন আরও উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়ার নেশায় মেতে উঠে। যুলকারনাইন বললেন ঃ তাহলে তোমরা কবর খনন করে রেখেছ কেন? সে বলল ঃ এর উদ্দেশ্য, যদি দুনিয়ার লোভ-লালসা আমাদেরকে পেয়েই বসে, তবে কবরগুলো দেখে তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারব এবং দীর্ঘ আশা আমাদের মন থেকে মুছে যাবে। হযরত যুলকারনাইন জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার বল, তোমরা শাক খাও কেন? পশুপালন করে সেগুলোর দুধ, মাংস ইত্যাদি খাও না কেন? সরদার বলল ঃ আমরা আমাদের উদরকে পশুদের কবর বানাতে চাই না। মাটিতে উৎপন্ন শাক দিয়েই প্রয়োজন মিটে যায়। জীবন ধারণের জন্যে সামান্যতম বস্তুই যথেষ্ট। এরপর সে হাত বাড়িয়ে যুলকারনাইনের পিছন থেকে একটি খুলি তুলে নিল এবং জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি জানেন এটা কার খুলি? যুলকারনাইন বললেন ঃ আমি কেমন করে জানব? সে বলল ঃ সে ছিল পৃথিবীর একজন সম্রাট। আল্লাহ তা'আলা তাকে পৃথিবীর রাজত্ব দান করেছিলেন; কিন্তু তাকে সীমালঙ্ঘন ও মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচার করতে দেখে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিলেন। এখন সে একটি ঢিলের মত গড়ে রয়েছে। তার সমস্ত কাজকর্ম আল্লাহ জানেন। কিয়ামতের দিন সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। এরপর আরও একটি প্রাচীন খুলি তুলে নিয়ে সরদার বলল ঃ এটা কার জানেন? যুলকারনাইন

বললেন ঃ না। সে বলল ঃ এটা আরেক সম্রাটের খুলি, যে তার পরবর্তী কালে ছিল। সে পূর্বসূরীর অত্যাচার-অবিচারের কথা জানত। সে মানুষের প্রতি বিনয় ও ন্যায় বিচার করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলও গণনা করে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন সে তার সওয়াব পাবে।

অতঃপর সরদার যুলকারনাইনের মস্তকের দিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে যুলকারনাইন, এই খুলিটিও পূর্বোক্ত উভয় খুলির মত হয়ে যাবে। অতএব, আপনি চিন্তাভাবনা করে কাজ করুন। হযরত যুলকারনাইন বললেন ঃ হে সরদার, যদি তুমি আমার সাথে চল, তবে আমি তোমাকে আমার উত্তরসূরী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সাম্রাজ্যের অংশীদার করব। সরদার আরয করল ঃ আমার এবং আপনার এক জায়গায় একত্রে থাকা সম্ভব নয়। কেননা, আপনার কাছে অগাধ ধনৈশ্বর্য ও বিপুল বিলাস-বৈভব থাকার কারণে জনসাধারণ আপনার শত্রু। অপরপক্ষে সকল মানুষ আমার মিত্র। কেননা, শত্রুতার কারণ হচ্ছে দুনিয়া। আমি দুনিয়াকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। একথা শুনে যুলকারনাইন তার কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি সরদারের কথাবার্তাকে চরম বিস্ময়, শিক্ষা ও উপদেশ মনে করতেন।

উপরোক্ত কাহিনী থেকেও প্রাচুর্যের ক্ষতি ও বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

ঃ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ঃ